গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৬ বর্ষ ৪৩ সংখ্যা | ১৪ - ২০ জুন ২০২৪ | Web: https://ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

রাজ্যে বেশি আসনে জিতেছে বলেই তৃণমূলের অপকীর্তি মুছে যায় না

এবারের লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের ২৯ আসন প্রাপ্তি, অর্থাৎ ৭টি বাড়তি আসন কি তাদের বিরুদ্ধে ওঠা সীমাহীন দুর্নীতি, গণতন্ত্র হত্যার যাবতীয় অভিযোগকে মিথ্যা প্রমাণ করে দিল? বেশি আসন পেয়েছে বলেই কি তাদের অপকর্মগুলির প্রতি জনগণের সমর্থন আছে ধরে নিতে হবে? ডায়মন্ডহারবার কেন্দ্রে তৃণমূলের জয়ের ব্যবধান সাত লক্ষ ছাড়ানোও কি তাদের প্রতি বিপুল জনসমর্থনের ঢেউয়ের ইঙ্গিত? বিচার করা দরকার।

লোকসভায় ২৯টি আসন পেয়ে তৃণমূল নেতৃত্ব এমন স্বপ্নও তাঁদের কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন যে, সারা ভারতে বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তাঁরাই চ্যাম্পিয়ন। ফলে বিজেপির এনডিএ জোটের শরিক এবং শিবির বদলে অতি দক্ষ দুই নেতা অন্ধ্রপ্রদেশের চন্দ্রবাবু নাইডুর তেলুগু দেশম (১৬ আসন) এবং বিহারের নীতিশ কুমারের জেডিইউ-কে (১২ আসন) ইন্ডিয়া জোটে ভাঙিয়ে আনতে পারলেই বিরোধীরা জোট সরকার গড়ে ফেলতে পারবে। অতি উৎসাহী কেউ কেউ সেই সরকারে মমতা ব্যানার্জীকে প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসানোর স্বপ্নও দেখছেন হয়ত! এই সুযোগে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দোপাধ্যায় নানা আঞ্চলিক দলের নেতাদের সাথে দৌত্য চালিয়ে নিজেদের দরকষাকষির জোরটাও পরখ করছেন ও সর্বভারতীয় স্তরে নিজেদের গ্রহণযোগ্যতা বাড়ানোর চেষ্টা চালাচ্ছেন।

এ কথা ঠিক, সারা দেশেই এবারের নির্বাচনে সংবাদমাধ্যম কথিত কোনও বিশেষ ঢেউয়ের জোর না থাকলেও দেশের বিরাট অংশের মানুষ বিজেপির অপশাসন আবার বৃদ্ধি পাওয়ার আশঙ্কায় নীরবে কিন্তু সুস্পষ্টভাবে মূলত বিজেপির বিরুদ্ধেই রায় দিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গে তার প্রধান প্রতিপক্ষ হিসাবে বিজেপির হাত থেকে আপাতত রক্ষা পাওয়ার জন্য বড় সংখ্যক মানুষ ভোট দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসকে। গোটা ভোটের প্রচার জুড়ে প্রধানমন্ত্রী সহ বিজেপি নেতারা মানুষের জীবনের জ্বলন্ত সমস্যা ছেড়ে হিন্দু-মুসলমান, মন্দির-মসজিদ নিয়ে প্রচার করে গেছেন। সাধারণ মানুষের প্রতি প্রবল তাচ্ছিল্য নিয়ে তাঁরা ভেবেছেন, মূল্যবৃদ্ধি-বেকারত্বের জ্বালায় প্রলেপ দিতে ধর্মীয় বিদ্বেষ আর রামমন্দিরের আবেগই যথেষ্ট। এতেই মানুষ সব ভুলে থাকবে! সাধারণ মানুষ এটাকে কোনও মতেই ভাল চোখে দেখেননি। যে কারণে খোদ রামমন্দির যে কেন্দ্রে, উত্তরপ্রদেশের সেই ফৈজাবাদে বিজেপি হেরেছে। বিজেপি নেতাদের চরম ঔদ্ধত্যকেও মানুষ ভালভাবে নেয়নি। তাঁদের ৪০০ পারের

দুয়ের পাতায় দেখুন

ডাক্তারির ভর্তি পরীক্ষায় কেলেঙ্কারি

দুর্নীতি দিয়ে শুরু নতুন মোদি সরকারের

এমবিবিএস কোর্সে ভর্তির জন্য সারা দেশে যে নিট-ইউজি পরীক্ষা নিয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালিত এনটিএ (ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি), তারই ফল প্রকাশিত হয়েছে ৪ জুন। ফলাফল প্রকাশ হওয়া মাত্র চূড়ান্ত বিতর্ক শুরু হয়েছে। নম্বর দেওয়া ও ফলাফল ঘোষণার স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা। নিট-ইউজি পরীক্ষার নিয়মাবলিতে যে ভাবে নম্বর দেওয়ার পদ্ধতি উল্লেখ করা হয়েছিল, সেই অনুসারেই বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত নম্বরে ব্যাপক অসঙ্গতি দেখা দিচ্ছে। এই অসঙ্গতিকে ন্যায্যতা দেওয়ার জন্য এনটিএ কিছু ছাত্রকে গ্রেস মার্ক দেওয়ার একটি ছেঁদো যুক্তি খাড়া করেছে।

কিন্তু কিসের ভিত্তিতে গ্রেস মার্ক দেওয়া হল সেটা সম্পূর্ণ অস্পষ্ট। এর ফলস্বরূপ

চারের পাতায় দেখুন

নিট কেলেঙ্কারি ঃ দোষীদের শাস্তি চাই

কলকাতা মেডিকেল কলেজ থেকে কলেজ স্ট্রিটে ছাত্রবিক্ষোভ মিছিল। ৮ জুন। খবর ছয়ের পাতায়

সীমাহীন ঔদ্ধত্য ধাক্কা খেতেই মোদিজির এই ভেকবদল

এ যেন ভূতের মুখে রামনাম! প্রধানমন্ত্রীর মুখে 'আমি সর্বধর্ম সমভাবের নীতির প্রতি দায়বদ্ধ' কথা শুনে দেশের মানুষের মনে এই কথাটাই প্রথম এসেছে। বিদ্বেষই যাঁর রাজনীতির মূল কেন্দ্রবিন্দু, তাঁর মুখে এমন কথা! বাস্তবে এ বারের নির্বাচন যত এগিয়েছে, যত তিনি বুঝেছেন তাঁর ৩৭০ আসনের লক্ষ্য অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে ততই তিনি বিদ্বেষের রাজনীতিতে ফিরে গেছেন। মুসলিমদের বিরুদ্ধে তাঁর পরবর্তী বক্তৃতাগুলি এতই তীব্র বিদ্বেষে ভরা ছিল যে কোনও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষেত্রে এমন বক্তব্য দেশের মানুষের ভাবনার অতীত।

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, আমার জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত ভারতের সংবিধানের মহান মূল্যে সমর্পিত। অথচ গত দশ বছর ধরে তাঁর মুখনিঃসৃত বাণীই প্রায় সংবিধানের জায়গা নিয়েছে। এ বার দেশবাসী প্রবল আশঙ্কায় ছিল, যদি বিজেপি-জোট সত্যিই ৪০০ আসনে জয়ী হয় তবে এই সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরেই সংবিধানকে ইচ্ছেমতো বদলে দেবে এবং কায়েম করবে অধিকতর স্বৈরাচারী শাসন।

তা হলে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নির্বাচিত হওয়ার পর নরেন্দ্র মোদি হঠাৎ সংবিধানে মাথা ঠেকাতে গেলেন কেন, আর সর্বধর্ম, সর্বমতের কথাই বা বলছেন কেন? তবে কি তিনি বিদ্বেষের রাজনীতি পরিত্যাগ করলেন? নির্বাচনের ফল তাঁর মানসিকতায় বিরাট কোনও পরিবর্তন ঘটিয়ে ফেলতে সক্ষম হল, যা আইনের শাসনের প্রতিও তাঁর শ্রদ্ধা বাড়িয়ে দিল?

বাস্তবে হিন্দুত্ববাদের আগ্রাসী রাজনীতি সত্ত্বেও একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনে চরম ব্যর্থতা এবং পুনরায়

চারের পাতায় দেখুন

মিথ্যা যুক্তিতে বিদ্যুতের মাশুল বাড়ানোর ছক সিইএসসি-র

আবার বিদ্যুৎ মাশুল বাড়িয়ে গ্রাহকদের ঘাড় ভেঙে তা আদায় করতে চায় সিইএসসি। এর জন্য ১০ মে তারা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের কাছে আবেদন করেছে। তারা দাবি করেছে, এফপিপিসিএ (ফুয়েল অ্যান্ড পাওয়ার পারচেজ কস্ট এ্যাডজাস্টমেন্ট), এপিআর (অ্যানুয়াল পারফরমেন্স রিভিউ), নেট ফিক্সড চার্জ ইত্যাদিতে ২০২০-'২১ ও ২০২১-'২২-এ মোট ২,৪৭,০৭৩ লক্ষ টাকা লোকসান হয়েছে। কমিশন দেশের লোকসভা নির্বাচনে মধ্যেই একচেটিয়া পুঁজিপতি

প্রতিরোধের ডাক অ্যাবেকার

গোয়েঙ্কার বিদ্যুৎ বন্টন কোম্পানি সিইএসসি-র এই আবেদন সম্পর্কে রাজ্যের গ্রাহক সহ স্টকহোল্ডারদের কাছে থেকে আপত্তি বা মতামত জানানোর জন্য সময় দেয় মাত্র ২১ দিন। অর্থাৎ ৩০ মে-র মধ্যেই স্টকহোল্ডারদের থেকে মতামত কমিশনের অফিসে পৌঁছানোর কথা। শেষ দফা নির্বাচন ছিল ১ জুন। ফল ঘোষণা ৪ জুন। এই পরিস্থিতিতে রাজ্যে বিদ্যুৎ

তিনের পাতায় দেখুন

তৃণমূলের অপকীর্তি মুছে যায় না

একের পাতার পর

স্লোগান মানুষের কাছে ঔদ্ধত্যের প্রতীক হিসাবেই দেখা দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী-স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীরা উচ্চনাদে পশ্চিমবঙ্গে ভাষণ দিয়ে ঔদ্ধত্যের পরিচয় যত দিয়ে গেছেন তত তাঁদের প্রতি সমর্থন কমেছে। এবারে সারা ভারতেই নরেন্দ্র মোদি যেখানে বেশি ভাষণ দিয়েছেন, সেখানেই বিজেপির ফল খারাপ হয়েছে। ইডি-সিবিআইকে দিয়ে বিরোধীদের হেনস্থা করার মতো ক্ষমতার অপব্যবহার মানুষকে শঙ্কিত করেছে। এই স্বৈরাচারী হুমকি ও ঔদ্ধত্যকে কোনও দিনই সাধারণ মানুষ ভাল চোখে দেখেন না। অতীতেও শাসকদলগুলিকে এর মূল্য চোকাতে হয়েছে।

যত দিন গেছে বিজেপি নেতারা বুঝতে পেরেছেন ৪০০ পার একেবারে হাস্যকর স্লোগানে পরিণত হচ্ছে। তত বেশি করে প্রধানমন্ত্রী নিজে চরম সাম্প্রদায়িক লাইন নিয়েছেন। তাঁরা ভেবেছিলেন সিএএ দিয়ে পশ্চিমবঙ্গে হিন্দু ভোট কিনবেন। তার জন্য অনেক গলা ফাটিয়েছেন। এমনকি ভোটের ঠিক আগে কয়েকজনকে সিএএ-তে নাগরিকত্বও তাঁরা দিয়েছেন। কিন্তু বাস্তবে তা বিরাট সংখ্যক হিন্দু জনগোষ্ঠীর মধ্যে আশঙ্কারই জন্ম দিয়েছে। হরিয়ানা, পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশের কৃষকদের বড় অংশ বিজেপির কৃষিনীতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে চেয়েছেন। উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাবের মানুষ বিজেপির স্বৈরাচারী শাসনকে হঠাতে চেয়ে ভোট দিয়েছেন। সারা ভারতেই বিজেপির বিদ্যুৎনীতি, শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে জনমত ধ্বনিত হয়েছে। বিজেপি বিরোধী এই মানসিকতার ছাপ পশ্চিমবঙ্গেও ছিল। যে কারণে এ রাজ্যের বহু গণতন্ত্রপ্রিয় সাধারণ মানুষ বলেছেন, যে জেতে জিতুক, বিজেপির হার চাই। কিন্তু তাঁরাও যখন নীতি ধরে খোঁজ করতে গেছেন, পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের সাথে বিজেপির শাসন-নীতির কোনও পার্থক্য কি তাঁরা পেয়েছেন?

বিজেপির চালু করা সর্বনাশা জাতীয় শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে দেশের প্রায় সমস্ত শিক্ষাবিদ প্রতিবাদ জানিয়েছেন। সেভ এডুকেশন কমিটি, এআইডিএসও এবং রাজনৈতিক দল হিসাবে এস ইউ সি আই (সি) এর বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলেছে। উল্লেখ্য, আন্দোলনের চাপে কর্ণাটক ও তামিলনাড়ু সরকার এই শিক্ষানীতি তাদের রাজ্যে চালু করবে না বলে ঘোষণা করেছে। কিন্তু তা চালু না করলে কেন্দ্রের টাকা পাওয়া যাবে না, এই অজুহাতে তৃণমূল কংগ্রেস সরকার পশ্চিমবঙ্গে চালু করে দিয়েছে। বিদ্যুৎনীতি, কৃষিনীতি, মূল্যবৃদ্ধি, হাজার হাজার সরকারি পদ খালি ফেলে রেখেও স্থায়ী সরকারি কাজে বেশিরভাগ ঠিকা শ্রমিক নিয়োগ ইত্যাদি সমস্ত নীতিতেই কেন্দ্রের বিজেপির সাথে রাজ্যের তৃণমূলের কোনও মৌলিক পার্থক্য নেই। ভোটের স্বার্থে তৃণমূল একদিকে নরম হিন্দুত্ব অন্যদিকে মুসলিম ভোটব্যাঙ্কের জন্য যা করা দরকার তাই করেছে। জাতপাতের রাজনীতিতেও তারা খামতি রাখেনি। এ সব কিছু বিজেপির সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিকল্প হওয়া দূরে থাক, সেই বিষ বাড়তে সাহায্য করছে।

তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে জনমানসে প্রবল ক্ষোভ এ রাজ্যে জনমানসে ধূমায়িত হয়েছে। শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী নিয়োগ নিয়ে ব্যাপক দুর্নীতি, বালি খাদান, কয়লা খাদান থেকে ব্যাপক দুর্নীতির সাথে যুক্ত হয়েছে গরু পাচার, নারী পাচার, শিশু পাচার, মদের ব্যাপক প্রসার, নারী নির্যাতন। আমফান ত্রাণ নিয়ে দুর্নীতি, সন্দেশখালিতে শাজাহানদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা, পুলিশ-প্রশাসনকে দলদাসে পরিণত করা— সামান্য বিবেকসম্পন্ন পশ্চিমবঙ্গবাসী মেনে নেননি। ১০০ দিনের কাজ না করেও বা যৎসামান্য কাজ দেখিয়ে টাকা আত্মসাৎ করা, আবাসন যোজনার টাকা প্রাপকদের সাথে ভাগাভাগি করা কি কোনও ভোটার মেনে নিতে পারেন?

তোলাবাজি, সাধারণ মানুষকে হুমকি দেওয়া, বেআইনি অস্ত্র কারবার রাজ্যে সাধারণ ঘটনা। বিদ্যুতের ১৪ দফা মূল্যবৃদ্ধি, কলকারখানা বন্ধ থাকা ও নতুন শিল্প স্থাপনে ব্যর্থতা, সরকারি কর্মচারীদের ডিএ না দিয়ে তাকে 'ভিক্ষের দান' বলে কটাক্ষ করা— কোনও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষই ভাল ভাবে নেননি। তৃণমূল কংগ্রেস নিজেদের প্রচারেও এ রাজ্যে কর্মসংস্থান কিংবা মানুষের রোজগারের সুযোগ বৃদ্ধির দাবি করেনি। তারা সরকারি তহবিল থেকে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, রূপশ্রী, কন্যাশ্রী প্রভৃতি অনুদানের প্রচারেই নির্ভর করেছে। অন্য পুঁজিতোষণকারী সরকারের মতোই অসহায় গরিব মানুষের ভোট পেতে এটাই তাদের সম্বল ছিল।

বহু মানুষ শুধুমাত্র বিজেপির জয় রুখে দেবার জন্য তৃণমূল কংগ্রেসকে পছন্দ না করলেও এমনকি তীব্র সমালোচনা করলেও তাদের প্রার্থীদের ভোট দিয়েছেন— তারাই বিজেপিকে হারাতে পারবে, এ কথা মনে করে। আবার এ কথাও ভুলে গেলে চলবে না, পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির শক্তি অর্জনের পিছনে অন্যতম কারণ হল তৃণমূলের অপশাসনের প্রতি মানুষের ক্ষোভ। শাসক পুঁজিপতি শ্রেণি তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভটা যাতে আন্দোলনের পথে চলে যেতে না পারে তার জন্য তাদের আর এক সেবাদাস বিজেপিকে বিকল্প হিসাবে তুলে ধরেছে। এজন্যই পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির কোনও সংগঠন না থাকা সত্ত্বেও বৃহৎ পুঁজি নিয়ন্ত্রিত সংবাদমাধ্যম তৃণমূলের বিকল্প হিসাবে বিজেপিকে ব্যাপকভাবে তুলে ধরেছে।

অবশ্য পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির গ্রহণযোগ্যতা তৈরির জন্য সিপিএমের ভূমিকার কথা উল্লেখ না করলে চলে না। ২০১৯-এ 'আগে রাম পরে বাম' করে তারা ব্যাপক সংখ্যায় বিজেপিকে ভোট দিয়েছিল। এ বারেও বহু সিপিএম সমর্থক 'তৃণমূলকে আগে হঠাই' বলে বিজেপিকে ভোট দিয়েছেন। সংবাদমাধ্যম ৩৪ বছর ধরে শাসন চালানো সিপিএমকে যতই তুলে ধরার চেষ্টা করুক না কেন, জনগণ তাদের শাসনকালের ভয়াবহ দিনগুলো আজও ভুলতে পারেনি। ফলে তৃণমূলকে চাই না, কিংবা বিজেপিকে চাই না ভেবেও সিপিএম তাদের বিকল্প হিসাবে মানুষের সামনে উঠে আসেনি। ভোট হয় তৃণমূলে, না হলে বিজেপিতে চলে গেছে।

অন্যদিকে, সিপিএম নেতারা বিকল্প হিসাবে বামপন্থী ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে না তুলে কংগ্রেস এবং আইএসএফ-এর হাত ধরেই সহজ পথে বাজিমাত করার আশায় ছিলেন। যদিও শেষপর্যন্ত আইএসএফ-এর সাথে তাঁদের জোট হয়নি। এস ইউ সি আই (সি) ঐক্যবদ্ধ বামপন্থী আন্দোলনের কথা বারবার তুলে ধরলেও সিপিএম নেতারা তাতে কর্ণপাত করেননি। ফলে এস ইউ সি আই (সি) একাই ব্লক স্তরে, জেলা স্তরে বিদ্যুতের সমস্যা নিয়ে, জবকার্ডের সমস্যা নিয়ে, চাষিদের ফসলের দামের সমস্যা সহ মানুষের নানা দাবি নিয়ে আন্দোলন গড়ে তুলেছে। জাতীয় শিক্ষানীতি এ রাজ্যে চালু করার বিরুদ্ধে রাজ্য জুড়ে নানা পথে আন্দোলন করেছে। আবার রাজ্যভিত্তিক আইন অমান্য বিক্ষোভ ইত্যাদি চালিয়ে গেছে। আন্দোলন করতে গিয়ে কর্মীরা পুলিশের মারে রক্তাক্ত হয়েছেন, দু'জন তাঁদের চোখ হারিয়েছেন। কিন্তু আন্দোলনটা চলছেই। অন্যদিকে সিপিএম নেতারা মাঝে মাঝে এ সব নিয়ে বিবৃতি দিয়েছেন, দু-একটা মিছিল করেছেন। যদিও বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তাঁরা সোসাল মিডিয়ায় ঝড় তুলেই আন্দোলন হচ্ছে বলে ভেবেছেন। কিন্তু সমস্যা হল তৃণমূল আজ যে সব জনবিরোধী কাজ করছে তার বেশিরভাগই তাঁদের আমলেই শুরু। ফলে তাঁদের কথা মানুষের কাছে বিশ্বাসযোগ্য হয়নি। আর কংগ্রেস-আইএসএফকে আন্দোলনের শক্তি হিসাবে সিপিএম নেতারাও ভাবতে পারেন কি? মানুষ তো ভাবেই না। ফলে তাঁদের জোট একটা নিছক ভোটের জোট ছাড়া কিছু হয়ে ওঠার কথাও ছিল না, হয়ওনি। একমাত্র এস ইউ সি আই (সি) ধারাবাহিকভাবে তৃণমূল ও বিজেপিকে আদর্শগতভাবে মোকাবিলা করে গেছে। যদিও বৃহৎ সংবাদমাধ্যম চেষ্টা করে গেছে এস ইউ সি আই (সি)-র বদলে তৃণমূলের বিকল্প হিসাবে সিপিএম-কংগ্রেস জোটকেই তুলে ধরতে, যাতে বিপ্লবী বামপন্থার শক্তি বৃদ্ধি আটকানো যায়। এর ফল হয়েছে বিপরীত। বিজেপি বিরোধী ভোট তৃণমূলের দিকেই চলে গেছে।

এর সঙ্গে উল্লেখ করা দরকার, ভোট লুঠের কাজে সিপিএমের ছেড়ে রাখা জুতোয় তৃণমূলের পা গলানোকে। আরামবাগ, কেশপুরে সিপিএম যে কায়দায় একসময় বুথে বুথে ১০০০-০ ভোটে বিরোধীদের হারানোর কৌশলের জন্য গর্ব করত, তৃণমূল সেই কৌশলের যোগ্য ছাত্র হয়েছে। এবারে সব কেন্দ্রে তারা তিন-চারজন করে ডামি প্রার্থী দিয়ে রেখেছিল, যাতে তারা ফাঁক পেলেই ছাপ্পায় হাত লাগাতে পারে। সারা রাজ্যেই বিশেষত শেষ তিনটি দফায় বেলা দুটোর পর ব্যাপক ছাপ্পা ভোটের আয়োজন করেছে তৃণমূল। কলকাতা, বিধাননগরের মতো শহর এলাকাতেও বহু বুথেই কোনও পরিচয়পত্র দেখার বালাই শেষ দিকে ছিল না। বিরোধীরা এতই দুর্বল যে তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ হয়েছে খুব কম জায়গায়। উত্তর কলকাতা ও যাদবপুরের বেশ কিছু বুথে এস ইউ সি আই (সি) এজেন্টরা ছাড়া অন্য দলের এজেন্টরা প্রতিবাদই করেননি। ডায়মন্ডহারবারে কার্যত অন্য দলকে তৃণমূল প্রচার করতেই দেয়নি। ফলতা বিধানসভার ফতেপুরে এস ইউ সি আই (সি)-কে প্রচারই করতে দেয়নি তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা। ডায়মন্ডহারবার বিধানসভার বোলসিদ্ধি-কালিনগর অঞ্চলে বদরতলা, বজবজ বিধানসভার বাওয়ালির ২১১ নম্বর বুথ, আত্মারামপুরে ১৭৫ নম্বর বুথে এজেন্ট ফর্ম কেড়ে নিয়েছে তৃণমূল। এছাড়াও এই লোকসভা কেন্দ্রে রেকর্ড ভোটে জেতার তাড়নায় তৃণমূলের দুষ্কৃতী বাহিনীকে, মোটরবাইক বাহিনীকে কয়েক মাস আগে থেকেই কাজে নামানো হয়েছিল বিরোধী ভোটারদের ভোটমুখী হওয়ার ইচ্ছাটাই মুছে ফেলতে। অনেক বুথে নাকি ১০০ শতাংশ ভোট পড়েছে! সিপিএমের অনিল বসু, নন্দরাণী ডলদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে তৃণমূল প্রার্থী অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় অনেক বুথেই ভোট পেয়েছেন হাজারের আশেপাশে, সেখানে বিরোধী দুই প্রার্থী দুটি-একটি করে, বাকিরা শূন্য ভোট পেয়েছেন। সব মিলিয়ে বলা যায়, তৃণমূলের কিছু বেশি আসন পাওয়া মানেই তার অপকর্মের কথা মানুষ ভুলে গেছে— এ কথা মনে করার কোনও কারণ নেই।

তিন মাস পরে পরীক্ষা। এখনও বই পেল না ছাত্ররা!

১৩ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হবে একাদশ শ্রেণির প্রথম সেমেস্টার পরীক্ষা। দীর্ঘ ছুটির পর ১০ জুন থেকে ক্লাস শুরু হয়েছে। কিন্তু এখনও ছাত্রছাত্রীরা বই পায়নি। এখনও বই ছাপা হয়ে বাজারে আসেনি। কী করে ক্লাস করবে ছাত্ররা? এ নিয়ে তীব্র ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে ছাত্র-শিক্ষক ও অভিভাবক মহলে।

রাজ্যের তৃণমূল সরকার কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের জাতীয় শিক্ষানীতি অনুসরণ করে এ বছর থেকে একাদশ শ্রেণিতে সেমেস্টার সিস্টেমে পরীক্ষা নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এস ইউ সি আই (সি) এর তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে। সরকার পরীক্ষা ব্যবস্থায় এত বড় পরিবর্তন আনতে যাচ্ছে অথচ তার কোনও পরিকাঠামোই গড়ে তোলেনি। সময়মতো বই ছাপতে দেওয়া, নির্ভুল বই ছাত্রছাত্রীদের কাছে পৌঁছনো ইত্যাদির ক্ষেত্রে যে তৎপরতার দরকার ছিল, সেক্ষেত্রে সরকার চূড়ান্ত দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয় দিয়েছে।

এর পরও শিক্ষার সর্বস্তরে শিক্ষকের অভাব। দেরিতে হলেও বই যদি ছাপা হয়ে আসে শিক্ষকের অভাবে ক্লাস ঠিকমতো হবে না। ক্লাস ঠিকমতো না হলে ছাত্রদের স্কুলে আসার মানসিকতা নষ্ট হবে। এই পরিস্থিতিতে বেড়ে যাবে প্রাইভেট কোচিং ব্যবসা।

তৃণমূল সরকার শিক্ষা নিয়ে চূড়ান্ত অপদার্থতার পরিচয় দিয়েছে। দীর্ঘ বছর ধরে শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষাই হচ্ছে না। যতটুকুও হয়েছিল সেখানে দুর্নীতি এবং টাকার খেলা। শিক্ষামন্ত্রী সহ অনেকেই জেলে। সরকারকে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় বই প্রকাশ করতে হবে এবং যথাযথ ক্লাসের জন্য পর্যাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে।

অধিকার রক্ষার দাবিতে লাদাখবাসীর অনন্য লড়াই

হিমালয়ের বুকে অবস্থিত ‘গিরিপথের দেশ’ বলে খ্যাত লাদাখ আজ এক ভয়ঙ্কর সঙ্কটের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। সেখানকার মানুষ আজ রাজপথে। ২০২০ সাল থেকেই তারা পথে নেমেছে, বিক্ষোভ দেখিয়েছে, কেন্দ্রের মোদি সরকারকে ‘প্রতারণা ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের’ জন্য কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে।

বিজেপি ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে এবং ২০২০ সালে ‘লেহ পার্বত্য কাউন্সিল’ নির্বাচনে লাদাখের জন্য সাংবিধানিক রক্ষাকবচ এবং সংবিধানের ষষ্ঠ তফসিলে অন্তর্ভুক্তির প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু বিজেপি-পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকার সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেনি। ফলে ক্ষোভের আগুন ধিকিধিকি জ্বলছে।

লাদাখে এই চলমান আন্দোলন আরও তীব্র হয়েছে ম্যাগসাইসাই পুরস্কার বিজয়ী পরিবেশ-কর্মী সোনম ওয়াংচুক সহ ‘কার্গিল ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্সের’ অনশন আন্দোলনে। ওয়াংচুক বলেছেন, তাঁর আন্দোলনের অন্যতম লক্ষ্য হল— হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলের অন্যান্য রাজ্য যেমন হিমাচল প্রদেশ, উত্তরাখণ্ড বা সিকিমের মতো লাদাখকে ধসপ্রবণ, ভঙ্গুর, শীতল মরুভূমিতে পরিণত না হয়।

সোনম ওয়াংচুক একজন দূরদর্শী শিক্ষাবিদ হিসাবে বিশ্বব্যাপী পরিচিতি লাভ করেছেন। তাঁর নির্মিত ‘বরফ স্তূপ বিদ্যালয়ে’ উদ্ভাবনী শিক্ষাপদ্ধতির জন্য এই স্বীকৃতি। তিনি দীর্ঘদিন ধরেই লাদাখের পরিবেশ সমস্যা নিয়ে কাজ করছেন। জলের সংকট মেটাতে ওয়াংচুক বরফ সংগ্রহের কৌশল ব্যবহার করে সাফল্য পেয়েছেন। লাদাখের পরিবেশ সংকট সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিকরতে তিনি তাঁর মঞ্চকে ব্যবহার করেছেন। লাদাখের মতো শূন্য ডিগ্রির নিচে প্রবল ঠাণ্ডা ও প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যে একটি খুব কম জনঘনত্বের অঞ্চলে তিরিশ হাজার মানুষের বিক্ষোভ দেখিয়ে দেয়, সেখানে সাধারণ মানুষের সঙ্কট কত ভয়াবহ। অন্য ন্যায্য আন্দোলনের মতোই লাদাখের এই আন্দোলনও বৃহৎ সংবাদমাধ্যমে বিশেষ জায়গা পায়নি। অথচ তাঁদের দাবিগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এই আন্দোলনের প্রতি ওই অঞ্চলের মানুষের সমর্থনও ব্যাপক।

৩৭০ ধারা বাতিল এবং লাদাখকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে পরিবর্তন

২০১৯ সালের ৫ আগস্ট কেন্দ্রের বিজেপি সরকার একতরফা ভাবে ৩৭০ ধারা বাতিল করে। জম্মু-কাশ্মীরের মানুষের মতামত গ্রহণ না করেই ৩৭০ ধারা রদ করা এবং জম্মু ও কাশ্মীর পুনর্গঠন আইনের মাধ্যমে জম্মু ও কাশ্মীরের প্রশাসনিক মানচিত্রে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনা হয়েছে, যা কাশ্মীর উপত্যকা শুধু নয়, জম্মু এবং লাদাখের মানুষের স্বাধিকারের ধারণায় ধাক্কা দিয়েছে। এস ইউ সি আই (সি) তখনই এর তীব্র বিরোধিতা করেছিল।

জম্মু ও কাশ্মীর পুনর্গঠন আইন লাদাখকে কেবল পুরনো জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে তা নয়, একই সঙ্গে সেই আইনের বলে রাজ্যের তকমা কেড়ে নিয়ে জম্মু ও কাশ্মীর, এবং লাদাখ নামক দুটি পৃথক কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে পরিণত করেছে। লাদাখে আইনসভা নেই। ফলে পরিবেশ সুরক্ষা, প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদ সুরক্ষা, পরিকাঠামো নির্মাণ, সাংস্কৃতিক ও অন্যান্য অধিকার রক্ষায় আইন প্রণয়নের ক্ষমতাসম্পন্ন বিধানসভা গঠনের, কিংবা স্বয়ংশাসিত প্রশাসন চালানোর উপযোগী একটি প্রাদেশিক সরকারকে নির্বাচিত করার সুযোগও রাজ্যবাসীর নেই। তাদের সব বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করে থাকতে হবে। লাদাখের মানুষের অভাব-অভিযোগ কে শুনবে? শত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এই বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় গণতন্ত্রের তথাকথিত শেষ অধিকার ভোটের মাধ্যমে নিজেদের প্রতিনিধি নির্বাচিত করার খাতায়-কলমে যতটুকু সুযোগ ছিল, সেই সুযোগটিও আর থাকল না। ফলে বছরের পর বছর কোনও কাজ না হোক, প্রশাসন যতই দুর্নীতিগ্রস্ত হোক, নির্বাচনের মাধ্যমে তাদের পরিবর্তন করার পার্লামেন্টারি ‘ক্ষমতা’টুকুও জনগণের হাতে অবশিষ্ট রইল না। সুতরাং, ভোটের জন্য আমাদের দেশে শাসক দলগুলোর ‘জনকল্যাণমূলক’ কাজ করার যে সামান্য বাধ্যবাধকতাটুকু থাকে সেটুকুও বিলুপ্ত হয়েছে।

হিল কাউন্সিলের মাধ্যমে আপেক্ষিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি

লাদাখের মানুষকে স্বায়ত্তশাসন দেওয়ার নামে ১৯৯০ এবং ২০১০-এর দশকে দুটি পার্বত্য কাউন্সিল গঠন করা হয়েছিল। লাদাখের মানুষ কাশ্মীরের সরকারি প্রশাসনের (রাষ্ট্রপতি শাসনের কারণে যার কর্তৃত্ব অধিকাংশ সময়ে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ছিল) কাছ থেকে উপেক্ষিত হওয়ার কারণে ক্রমেই তাদের দাবিগুলি মেটানোর জন্য ওই হিল কাউন্সিলগুলোর কাছে দরবার করত। কিন্তু হিল কাউন্সিলগুলি সেদিনও শ্রীনগরের কর্তাব্যক্তিদের অধীনস্থ ছিল, আর আজও তারা কেন্দ্রীয় সরকারের আমলাতন্ত্রের মর্জির উপর নির্ভরশীল। স্বায়ত্তশাসন কথাটা কেবল খাতায়-কলমে রয়ে গেছে। এমনকি ২০১৯ সালের পরে পার্বত্য কাউন্সিলের বাজেট প্রায় চার গুণ করা হলেও, কাউন্সিলরদের কোনও ক্ষমতাই বাস্তবে নেই, সবই আমলাদের নিয়ন্ত্রণে। অর্থাৎ স্বায়ত্তশাসনের ছিটেফোঁটাও নেই। ফলে ক্ষোভ বাড়ছিলই।

উদ্বেগের বিষয়

লাদাখের মানুষের সাংস্কৃতিক সত্তার যে বিশেষত্ব ছিল, তা আজ বিপন্ন। সেখানকার জনবিন্যাসের চরিত্র পরিবর্তনের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। বিশেষত বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ করে পর্যটন ব্যবসায় বৃহৎ পুঁজিপতিদের বিপুল বিনিয়োগের ফলে সেই আশঙ্কা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে দাবি উঠেছে, লাদাখের জমির মালিকানা স্থানীয়দের নিয়ন্ত্রণেই রাখতে হবে এবং সরকারি চাকরিতে স্থানীয়দের নিয়োগ করতে হবে। দাবি উঠেছে, লাদাখের পরিবেশ ও বাস্তুতন্ত্র রক্ষা করতে হবে। ৩৭০ ধারা বিলোপের পর যে নতুন ‘ডোমিসাইল আইন’ তৈরি হয়েছে সেই আইন অনুসারে লাদাখের ছেলেমেয়েরা আর জম্মু-কাশ্মীরে চাকরি করার জন্য যোগ্য নয়। এর প্রতিবিধানে বিজেপি সরকার ২০১৯-এর আগস্টের পরে যে ‘অতিরিক্ত চাকরি সৃষ্টি’র প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তাও মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়েছে।

লাদাখকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে পরিণত করায় বহু লাদাখবাসী প্রথমে স্বায়ত্তশাসনের কল্পিত স্বপ্নে বিভোর হয়ে বিজেপি-সরকারের ওই পদক্ষেপকে সমর্থন করলেও দ্রুত তাদের ভুল ভেঙেছে। তাঁরা দেখেছেন, জম্মু-কাশ্মীরের অঙ্গ হওয়ার কারণে ৩৫এ ধারার বলে সেখানকার জমি বাইরের কেউ

ছয়ের পাতায় দেখুন

মাশুল বাড়ানোর ছক সিইএসসি-র

একের পাতার পর

গ্রাহকদের একমাত্র সংগঠন অ্যাবেকার পক্ষ থেকে আরও মাত্র ১৫ দিন সময় বাড়ানোর আবেদন জানানো হয়েছিল। কিন্তু কমিশন তাতে কর্ণপাত করেনি। স্বাভাবিক ভাবেই তা রাজ্য সরকারের দ্বারা মনোনীত এই বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের নিরপেক্ষ ভূমিকা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলে দেয়।

দেখা যাক বিদ্যুতের এই দাম বাড়ানোর আবেদনের কোনও গ্রহণযোগ্য যুক্তি আছে কি না। প্রথমত, বিদ্যুৎ আইন-২০০৩-এর ৬২(৪) ধারা অনুযায়ী যদি ফুয়েল (কয়লা) এবং পাওয়ার (বিদ্যুৎ) কেনার জন্য বাড়তি খরচ লাগে, তবে এই ধারায় বলা হয়েছে কোম্পানি এমভিসিএ (মাস্থলি ভ্যারিয়েবল কস্ট অ্যাডজাস্টমেন্ট) খাতে সেই বাড়তি খরচ সেই সময়ের গ্রাহকদের বিলে আদায় করতে পারে। কিন্তু সেটা কোম্পানি করেনি। এটাই প্রমাণ করে ওই সময় কয়লার দাম ও বিদ্যুৎ কেনার খরচ বাড়েনি। দ্বিতীয়ত, বিদ্যুৎ আইন-২০০৩-এর ৬১(সি) ধারায় পরিষ্কার বলা হয়েছে, বিদ্যুতের মাশুল নির্ধারণের সময় কোম্পানিকে তার সমস্ত রিসোর্সের ইকোনোমিক্যাল ব্যবহার করতে হবে। এখন দেখা যাক সেটা কোম্পানি করেছে কি না।

কেন্দ্রীয় সরকারের থেকে ২৫ শতাংশ কম দামে উৎকৃষ্ট মানের যে কয়লাখনি পেয়েছে সিইএসসি, যাকে ক্যাপটিভ কয়লাখনি বলা হয় সেখান থেকে তারা মাত্র ৩৯ শতাংশ কয়লা নিয়েছে। অথচ ৯০ শতাংশ কয়লা সেখান থেকেই নেওয়া যেত। কেন ক্যাপটিভ কয়লাখনি থেকে ৯০ শতাংশ কয়লা নেওয়া হল না? কোম্পানি তাদের এপিআর-এ বজবজ স্টেশনে ব্যবহৃত কয়লার যা দাম দেখিয়েছে (২০২১-২২ বর্ষে) তার সাথে ওই সময়ের (২৭-১১-২০২০) কোল ইন্ডিয়া লিমিটেডের কয়লার দামের তুলনামূলক তালিকা এই রকম।

	বজবজ স্টেশন	কোল ইন্ডিয়া লিমিটেড
ক্যাটেগরি	প্রতি মেট্রিক টন	প্রতি মেট্রিক টন
জি-৩	৪৭৪৮ টাকা	৩১৫৪ টাকা
জি-৪	৪৫৬৩ টাকা	৩০১০ টাকা
জি-৮	২৭৪৬ টাকা	১৪৭৫ টাকা
জি-১২	১৮১৭ টাকা	৮৯৬ টাকা

এ ছাড়াও কোল ইন্ডিয়া লিমিটেড গত ৪ সেপ্টেম্বর ২০১৯ (অক্টোবর ২০১৯ থেকে মার্চ ২০২০ পর্যন্ত) ই-অকশনে দ্বিতীয় ফেজে জি-৪ ক্যাটেগরির কয়লা বিক্রি করেছে ৩০০০ টাকা প্রতি মেট্রিক টন।

এ বার পাওয়ার পারচেজের বিষয়ে দেখা যাক সিইএসসি বিদ্যুৎ আইনের ৬১(সি) ধারা মেনেছে কি না। সিইএসসি তাদের এপিআর-এ দেখিয়েছে, ক্রিসেন্ট পাওয়ার প্রাইভেট লিমিটেড গত ৩১-৭-২০২০তে জানিয়েছে, তারা ২৪ ঘন্টা ধরে ৩৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ প্রতি ইউনিট ৩ টাকা ৬৫ পয়সা দরে দেবে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানি ওই সময় প্রতি ইউনিট ২ টাকা ১৬ পয়সা থেকে ২ টাকা ৭০ পয়সা দরে তা দিয়েছে। কিন্তু এই সিইএসসি তার প্রয়োজনের বেশিরভাগ বিদ্যুৎ কিনেছে তাদেরই বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র হলদিয়া এনার্জি থেকে গড়ে প্রায় সাড়ে পাঁচ টাকা প্রতি ইউনিট দরে। তারা দেখিয়েছে ২০২১-২২ বর্ষে গ্রীষ্মকালে হলদিয়া এনার্জি থেকে মোট ১৪১৯ মেগা ইউনিট বিদ্যুৎ কিনেছে প্রতি ইউনিট ৫ টাকা ২০ পয়সা দরে। বর্ষাকালে তারা হলদিয়া এনার্জি থেকে মোট ১৪৮৬ মেগা ইউনিট বিদ্যুৎ কিনেছে প্রতি ইউনিট ৫ টাকা ২০ পয়সা দরে। শীতকালে তারা হলদিয়া এনার্জি থেকে মোট ৯৯২ মেগা ইউনিট বিদ্যুৎ কিনেছে প্রতি ইউনিট ৫ টাকা ২১ পয়সা দরে। যে কেউ বুঝবেন, এই হিসাব কারচুপিতে ভরা।

এই হিসাব দেখিয়ে সিইএসসি তার গ্রাহকদের ঘাড়ে বাড়তি বিদ্যুতের দামের বোঝা চাপাতে চেয়ে রাজ্য বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের কাছে যে আবেদন করেছে তা যুক্তিগ্রাহ্য নয়। অ্যাবেকা এই অযৌক্তিক বিদ্যুতের মাশুল বৃদ্ধির আবেদনের তীব্র বিরোধীতা করে ২৯ মে অনলাইনে (ই-মেল) এবং ৩০ মে হার্ড কপি স্পিড পোস্টে কমিশনকে চিঠি পাঠিয়েছে। এখন দেখার, কমিশন কী ভূমিকা পালন করে। যদি কমিশন সিইএসসি-র এই আবেদন মেনে নিয়ে বিদ্যুতের মাশুল বাড়িয়ে দেয়, তা হলে সিইএসসির বিদ্যুৎ গ্রাহকদের বর্তমান বিদ্যুৎ বিলের সাথে এই ব্যাপক বর্ধিত মাশুল বকেয়া হিসাবে মাসে মাসে দিতে হবে। যদিও গ্রাহকরা বিগত ২০২০-২১ ও ২০২১-২২ বর্ষের প্রতি মাসের বিদ্যুতের বিলের টাকা সেই সময়েই পরিশোধ করেছেন। কলকাতা ও তার সংলগ্ন সিইএসসির বিদ্যুৎ গ্রাহকরা এই চরম অন্যায় মেনে নিতে পারেন না। অ্যাবেকা এই অযৌক্তিক মাশুল বৃদ্ধির বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য গ্রাহকদের কাছে আহ্বান জানিয়েছে।

মোদিজির ভেকবদল

একের পাতার পর

প্রধানমন্ত্রীর গদির দখল নেওয়ার লোভেই মোদির এমন ভেকবদল, এমন বিড়াল তপস্বী সাজা!

অষ্টাদশ লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল নানা দিক থেকেই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এই নির্বাচনে মোদি শাসনের অবসান না ঘটলেও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ঔদ্ধত্য এই নির্বাচনে বিরাট ধাক্কা খেয়েছে। বাস্তবে গত দুটি নির্বাচনে বিজেপির নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা এক দিকে দলের মধ্যে এবং অন্য দিকে সরকারে মোদিকে একাধিপত্য কায়েমের সুযোগ করে দিয়েছিল। অন্য দিকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও সমস্ত সুযোগ সুবিধা তাঁর ঘনিষ্ঠ কয়েক জন ধনকুবেরের হাতে কুক্ষিগত হয়ে উঠেছিল। এই কয়েক জনই দেশের সমস্ত সম্পদ ব্যবহারের সুযোগ পেয়েছিল এবং অর্থনীতিকেও নিয়ন্ত্রণ করছিল। তাদের দিকে লক্ষ্য রেখেই মোদি সরকার তৈরি করেছিল একের পর এক আইন, যা জনস্বার্থকে পুঁজির স্বার্থের কাছে বিকিয়ে দিয়েছিল। তা সত্ত্বেও এই সময় ধরে এমনকি দরিদ্র মানুষেরও একাংশ ধনকুবের-তোষী এই সরকারকে সমর্থন করে গেছে। কারণ মোদির নেতৃত্বে বিজেপি হিন্দুত্বের ধুয়ো তুলে দেশ জুড়ে এমন একটা মেরুকরণ ঘটাতে সক্ষম হয়েছিল যা তাদের জীবনের গুরুতর সমস্যাগুলিকেও পিছনে ঠেলে দিতে সক্ষম হয়েছিল। এ বারের নির্বাচন বিজেপি রাজনীতির মেরুকরণের এই আগ্রাসী ধারাটিকে অনেকখানি আটকে দিতে পেরেছে।

রাষ্ট্রে একচেটিয়া পুঁজির প্রবল আধিপত্যের এই যুগে বিশ্ব জুড়ে রাষ্ট্রীয়তাবাদী-জনপ্রিয়তাবাদী নেতাদের মতোই নরেন্দ্র মোদি ঘোষণা করেছিলেন, তিনি একাই জাতি। বিরোধীদের জাতীয়তা-বিরোধী তকমা দিয়ে বাতিল করে দিয়েছিলেন। জনমতের কোনও তোয়াক্কা করেননি। শ্রমিক-কৃষক-সাধারণ মানুষের দাবিগুলিতে কর্ণপাত করেননি। একদল ধামাধরা রাজনীতিক, ছদ্ম বুদ্ধিজীবী এবং এক দল পেটোয়া সাংবাদিক তাঁর এই দেশ-ঊর্ধ্ব, জাতি-ঊর্ধ্ব হামবড়ামির পিছনে ধুয়ো ধরেছিলেন। তারই পরিণামে সংখ্যালঘু, বিশেষত মুসলিমদের রাষ্ট্র তথা সমাজের এক কোণে ঠেলে দিয়ে তিনি ঘোষণা করেছিলেন— হিন্দুত্বই ভারতীয়ত্ব।

বিজেপির বিজয়রথের ঘোড়া একক সংখ্যাগরিষ্ঠতায় পৌঁছনোর আগেই রুখে দিয়েছে দেশের মানুষ। মোদিরা ভেবেছিলেন, গোয়েবলসীয় কায়দায় যা তাঁরা জোরের সঙ্গে এবং বারে বারে প্রচার করবেন, মানুষ তাকেই সত্য বলে মেনে নেবে। বাস্তবে তা হয়নি।

বিজেপির হিন্দুত্বের রাজনীতি যে মানুষের জীবনের গুরুতর সমস্যাগুলিকে ছাপিয়ে যেতে পারেনি তার বড় প্রমাণ উত্তরপ্রদেশেও বিজেপির ব্যাপক পরাজয়। উত্তরপ্রদেশ, যাকে গুজরাটের বাইরে বিজেপির সর্ববৃহৎ আদর্শগত হৃদয়ভূমি হিসাবে দলের নেতারাই দেশ জুড়ে পরিচিত করেছেন, সেখানে পরাজয় কার্যত বিজেপির হিন্দুত্ববাদ ভিত্তিক রাজনীতিরই পরাজয়। যে অযোধ্যা গত তিন দশক ধরে বিজেপির হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির কেন্দ্রভূমি, যে অযোধ্যায় বাবরি মসজিদ ধ্বংস করেই বিজেপির ভারতীয় রাজনীতিতে উত্থান, যে অযোধ্যায় রামমন্দির প্রতিষ্ঠাকে বিজেপি তাঁদের প্রধানতম সাফল্য হিসাবে দেশের মানুষের কাছে উপস্থিত করেছে, যে অযোধ্যার অসমাপ্ত রামমন্দির উদ্বোধন করেই নরেন্দ্র মোদি গোটা দেশ জুড়ে মানুষকে হিন্দুত্বের ঢেউয়ে ভাসিয়ে দেবেন ভেবেছিলেন, সেই অযোধ্যা যে লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্ভুক্ত, সেই ফৈজাবাদে পরাস্ত হয়েছেন বিজেপির প্রতিনিধি।

গত দুবার যে কেন্দ্র থেকে বিজয়ী হয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী, সেই বারাণসী, যে প্রাচীন শহরটিকে বিশ্বে হিন্দু-পর্যটনকেন্দ্রে পরিণত করা ছিল নরেন্দ্র মোদির অন্যতম প্রিয় বাসনা, যার জন্য সেখানকার শত শত প্রাচীন মন্দিরকে গুঁড়িয়ে দিয়ে, শত শত বাড়ি-ঘর ভেঙে কয়েক হাজার মানুষকে উচ্ছেদ করে দিয়ে বিরাট কাশী-বিশ্বনাথ করিডর তৈরি করেছেন, শহরটিকে ঝাঁ-চকচকে করে বিশ্বনাথ মন্দিরকে এক কর্পোরেট মন্দিরে পরিণত করেছেন, সেই বারাণসী কেন্দ্রে প্রধানমন্ত্রী এক অখ্যাত প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে মাত্র দেড় লক্ষ ভোটে জয়ী হয়েছেন। অথচ তিনি নিজেই জয়ের লক্ষ্যমাত্রা ৬ লক্ষে বেঁধে দিয়েছিলেন। বাস্তবে এই জয় কি প্রধানমন্ত্রীর পরাজয় নয়, নিজেকে হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির আইডলে পরিণত করা নরেন্দ্র মোদিকে প্রত্যাখ্যান নয়?

বিজেপি নেতারা ধরেই নিয়েছিলেন, ২০১৯-এর মতো এ বারও উত্তরপ্রদেশ জুড়ে তাঁদের একচ্ছত্র আধিপত্য কায়েম থাকবে। বাস্তবে দেশে এ বার মোদি-ঢেউ বলে কিছু ছিল না। বরং তার জায়গা দখল করে নিয়েছিল মানুষের জীবনের গুরুতর সমস্যাগুলি এবং ধনকুবেরদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব ও সাধারণ মানুষের প্রতি বঞ্চনার অভিযোগগুলি। ধনকুবেরদের তোষামোদে আর মন্দির-রাজনীতিতে বুঁদ হয়ে থাকা বিজেপি সাধারণ মানুষের জীবনের সমস্যাগুলি, মূল্যবৃদ্ধি, বেকারত্ব প্রভৃতিকে গুরুত্বই দেয়নি। সাধারণ মানুষ, বিশেষত দলিত এবং দরিদ্র অংশের আর্থিক উন্নয়নের দিকে নজরই দেয়নি। মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ ধরেই নিয়েছিলেন বুলডোজার রাজনীতি দিয়েই সব বিরোধিতাকে গুঁড়িয়ে দেবেন। দৃশ্যত তা সম্ভব হলেও সত্যিই যে তা এমনকি কোনও উদ্ধত শাসকের পক্ষেও সম্ভব নয়, নির্বাচনের ফল তা প্রমাণ করে দিয়েছে। উত্তরপ্রদেশে গত নির্বাচনে এনডিএ পেয়েছিল ৭৪টি আসন, সেখানে এ বার ইন্ডিয়া পেয়েছে ৪৩টি আসন, এনডিএ পেয়েছে ৩৬টি। অথচ প্রথম দফা ভোটের পর থেকেই মোদি মুসলমান বিরোধী প্রচারকে তুঙ্গে তুলেছিলেন এবং তা এমনই কটু, যা গত দু-দশকে দেশের মানুষ দেখেনি। ২০১৪ থেকে এই প্রথম বিজেপি মন্দির-মসজিদ রাজনীতিকে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক বিক্ষোভকে চাপা দেওয়ার কাজে ব্যবহার করতে পারল না।

বিজেপির এই স্বৈরাচারী রাজনীতির ব্যর্থতার আরও একটা বড় কারণ কৃষক আন্দোলনের প্রভাব। গণআন্দোলন সাম্প্রদায়িক প্রভাব থেকে মানুষকে বের করে এনে জীবনের বাস্তব সমস্যার সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়। এই আন্দোলনকে আরও সংহত করা গেলে বিজেপির আরও বেশি পরাজয় নিশ্চিত করা যেত।

বিজেপির হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির ব্যর্থতা শুধু উত্তরপ্রদেশেই দেখা গেল এমন নয়। রাজস্থানের বারমের কেন্দ্রে পরাস্ত হয়েছে বিজেপি। যেখানে মোদি প্রচারের সময় ভারতীয় মুসলিমদের সম্পর্কে অতি জঘন্য শব্দ ব্যবহার করেছিলেন। মুসলমান বোঝাতে তাদের 'ঘুসপেটিয়া' (অনুপ্রবেশকারী) এবং 'যারা বহু সন্তানের জন্ম দেয়', এই ভাবে পরিচয় দিয়েছেন। গুজরাটের বনসকন্থা আসনেও, যা একটি গো- পালন (ডেয়ারি) নির্ভর শহর, সেখানেও পরাজিত হয়েছে বিজেপি। এখানেই প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, বিরোধীরা জিতলে আপনাদের মধ্যে যাঁদের দুটি মহিষ আছে, তার একটি কেড়ে নিয়ে মুসলমানদের দিয়ে দেবে। এই সবই প্রমাণ করে, এই নির্বাচনে বিজেপির হিন্দুত্বের রাজনীতি মানুষকে তেমন ভাবে প্রভাবিত করতে পারেনি।

কিন্তু একটা কথা মনে রাখতে হবে, গোটা নির্বাচন পর্ব জুড়ে প্রধানমন্ত্রী যে বিষ সমাজমননে ছড়িয়ে দিলেন, বিজেপির এই পিছু হঠা সত্ত্বেও তা কিন্তু সমাজ পরিসরে থেকে গেল। যার বিরুদ্ধে সর্বদা সাংস্কৃতিক আন্দোলন জারি না রাখলে যে কোনও মুহূর্তে তা বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে।

এই অবস্থায় বিজেপি গত দশ বছরের শাসনে মানুষের যে গণতান্ত্রিক অধিকারগুলি কেড়ে নিয়েছে, দেশের জনগণকে আজ সেগুলিকে ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি তুলতে হবে, বিচারব্যবস্থা এবং সংবাদমাধ্যম সহ গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে কুক্ষিগত করার যে ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছিল তা থেকে এই বিভাগগুলিকে মুক্ত করার দাবি তুলতে হবে।

একই সঙ্গে জনজীবনের সমস্যাগুলি সমাধানের দাবিতে গণআন্দোলনগুলিকেও জোরদার করতে হবে। এই প্রতিটি আন্দোলনেই সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে আদর্শগত সংগ্রামকে জোরদার করতে হবে। পাশাপাশি, সংসদীয় বিরোধী দলগুলিও যাতে শুধু ক্ষমতা দখলের খেলায় মত্ত না থাকে, তাদের উপর জনগণের দেওয়া দায়িত্ব যাতে তারা ঠিক মতো পালন করে তার জন্য জনগণের সচেতন নজরদারি রাখতে হবে। এ কাজ সম্ভব একমাত্র জনগণকে সংগঠিত করে ব্যাপক গণআন্দোলন গড়ে তোলার দ্বারাই। আন্দোলনের চাপই পারে সরকারকে জনবিরোধী কাজের থেকে বিরত করতে। একইভাবে বিরোধী দলগুলিকে আন্দোলনই বাধ্য করে ক্ষমতার বাইরে জনস্বার্থ নিয়ে কিছুটা হলেও ভাবতে।

নিটের রেজাল্টে ব্যাপক দুর্নীতি

একের পাতার পর

দেখা যাচ্ছে, ৬৭ জন পরীক্ষার্থী একশো শতাংশ নম্বর পেয়ে শীর্ষস্থান অধিকার করেছে যা নিট ইউজি-র মতো কঠিন পরীক্ষায় একেবারেই অস্বাভাবিক। ফলে পরীক্ষার দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা এনটিএ এবং তাদের নেওয়া পরীক্ষা-পদ্ধতির বিশ্বাসযোগ্যতা ও সততা আজ প্রশ্ন চিহ্নের সম্মুখীন। এরকমও দেখা গেছে যে, একই কেন্দ্রের অনেকজন পরীক্ষার্থীর প্রাপ্ত নম্বর সমান।

পরীক্ষার আগেই প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ারও অভিযোগ উঠেছিল। যদিও তার কোনও তদন্ত হয়নি এবং প্রশ্ন ফাঁস প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও নেওয়া হয়নি। ইতিমধ্যে এনটিএ-র চূড়ান্ত দুর্নীতির কারণে অপ্রত্যাশিত খারাপ ফল হওয়ার কারণে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে আত্মহত্যার মতো দুঃখজনক ঘটনা ঘটছে। উল্লেখ্য, নিট-ইউজির ফল প্রকাশের দিন নির্ধারিত ছিল ১৪ জুন। অথচ লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার দিনেই তাড়াহুড়ো করে এর ফল প্রকাশ করা হল। অনেকেরই প্রশ্ন ভোটের ফল বেরনোর ডামাডোলে পরীক্ষার ফলাফল নিয়ে কেলেঙ্কারি চাপা পড়ে যাবে, এই আশাতেই কি প্রকাশের দিন বদল করা হয়েছিল? ঘটনাগুলি থেকে এটা স্পষ্ট যে নিট-ইউজি ২০২৪ ফলাফলের ঘোষণায় একটি বিরাট কেলেঙ্কারি হয়েছে।

বিজেপি সরকার সমস্ত রকমের গণতান্ত্রিক রীতিনীতি উপেক্ষা করে একসময় দুর্নীতি দূর করার ভাঁওতা দিয়ে দীর্ঘদিনের পরীক্ষিত রাজ্য-ভিত্তিক প্রবেশিকা পরীক্ষা (জেইই, সিইটি, ইএমসিইটি, ইত্যাদি) বাতিল করে সারা দেশে অভিন্ন নিট-ইউজি পরীক্ষা একতরফাভাবে চাপিয়ে দিয়েছিল। এর প্রতিবাদ করে এআইডিএসও-র পক্ষ থেকে সুস্পষ্টভাবে সতর্ক করা হয়েছিল, দুর্নীতিবাজদের কঠোর শাস্তি এবং দুর্নীতির কারণ নির্মূল না করে আরেকটি কেন্দ্রীভূত পরীক্ষা চালু করা হলে আরও মারাত্মক দুর্নীতিকেই প্রশ্রয় দেওয়া হবে। এই উদ্বেগ কতটা সঠিক ছিল সেটা আজ প্রমাণিত। কেন্দ্রীভূত পরীক্ষা চিকিৎসা শিক্ষার গুণ-মান বাড়াবে এই ছেঁদো যুক্তির ফানুস আজ চুপসে গেছে। সুতরাং, নিট পরীক্ষার বিশ্বাসযোগ্যতা এবং স্বচ্ছতা যখন প্রশ্নচিহ্নের সামনে, তখন নিট-ইউজি প্রবর্তনের উদ্দেশ্য কী সেটাও আবার ভাবার সময় এসেছে। এই সিদ্ধান্তটি কি সত্যিই ছাত্রদের কথা ভেবে নাকি কোচিং ইন্ডাস্ট্রির স্বার্থেই এটা চালু হয়েছিল? দুর্নীতিবাজ সরকারগুলির পরীক্ষা ব্যবস্থাটাকেও বাণিজ্যিকীকরণের আওতায় নিয়ে আসার নীতির অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে মেডিকেলে ভর্তির পরীক্ষার পুরো ব্যবস্থাই এখন ভেঙে পড়ার মুখে, আর তার অসহায় শিকার হচ্ছে নিরীহ ছাত্রছাত্রীরা। এর ফলে মেডিকেল শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্যের মানও মারাত্মকভাবে ক্ষতির সম্মুখীন।

এই পরিস্থিতিতে, এআইডিএসও নিট-ইউজি পরীক্ষা কেলেঙ্কারির নিরপেক্ষ বিচারবিভাগীয় তদন্ত দাবি করেছে। সংগঠন দাবি জানিয়েছে, এই দুর্নীতিতে যুক্ত প্রত্যেকের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক তরুণকান্তি নস্কর নিট-এর ফল দুর্নীতির প্রতিবাদ জানিয়ে রাজ্যভিত্তিক জয়েন্ট এন্ট্রান্স চালুর দাবি জানিয়েছেন। সার্ভিস ডক্টরস ফোরামের পক্ষ থেকে এই দুর্নীতির বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবি জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির কাছে চিঠি দেওয়া হয়েছে। মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার বিচারবিভাগীয় তদন্ত ও দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছে।

স্মার্টফোনে আসক্তি ঃ প্রযুক্তি নয়, অপরাধী এই মুনাফাসর্বস্ব ব্যবস্থা

স্কুলে স্মার্টফোন কেড়ে নেওয়ায় ক্ষিপ্ত ছাত্রদের আক্রমণে অশিক্ষক কর্মীর মৃত্যু, রক্ত বিক্রি করে স্মার্টফোন কেনার চেষ্টা, ফোন না পেয়ে আত্মহত্যা, এমনকি দুধের সন্তানকে বিক্রি করে ফোন কেনার টাকা জোগাড়ের মতো ঘটনা এখন খবরে আসছে। এর সাথে আছে চলন্ত ট্রেনের সাথে সেলফি তুলতে গিয়ে দুর্ঘটনায় মৃত্যুর ঘটনাও।

শিউরে ওঠার মতো এসব ঘটনাকে আজ আর 'বিরলতম' বলা যাচ্ছে না। বরং শিশু-কিশোর থেকে শুরু করে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে স্মার্টফোন নামক হাতের মুঠোয় থাকা যন্ত্রটির প্রতি আসক্তি যে ক্রমশ বিপজ্জনক হয়ে উঠছে কমবেশি সকলেই তা জানেন। এবং আজ তা অল্প কিছু পরিবারে বা সমাজের কোনও নির্দিষ্ট স্তরের মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। বাড়ি, স্কুল-কলেজ, কর্মক্ষেত্র, রাস্তাঘাট সর্বত্র চোখ মেলে তাকালেই দেখা যাবে এই আসক্তির ভয়ঙ্কর রূপ, যা ড্রাগ-মদের নেশার চেয়ে কোনও অংশে কম ভয়ানক নয়। ভালো করে বসতে পর্যন্ত শেখেনি, এমন শিশুকে শান্ত রাখতে মা-বাবা ধরিয়ে দিচ্ছেন স্মার্টফোন। এক থেকে ছয়-সাত বছরের বাচ্চাদের একটা বড় অংশ খাওয়ার সময় ফোনের পর্দায় চোখ রেখে খেতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ছে এবং পরে স্বভাবতই ফোন না দিলে তাদের খাওয়ানো যাচ্ছে না। জেদ, চিৎকার, জিনিস ছুঁড়ে ফেলা থেকে শুরু করে তৈরি হচ্ছে নানা ধরনের মানসিক অসুখ, ছুটতে হচ্ছে মনোচিকিৎসকের দরজায়।

এই মুহূর্তে ঠিক কতটা ভয়ানক আকার ধারণ করেছে এই স্মার্টফোনের নেশা, তার আন্দাজ পাওয়া যাবে অ্যানুয়াল স্ট্যাটাস অফ এডুকেশন রিপোর্টে উঠে আসা সাম্প্রতিক তথ্য থেকে। দেশের ২৬টি রাজ্যের ২৮টি জেলায় চালানো সমীক্ষায় দেখা গেছে, দেশের ৯০.৫ শতাংশ কিশোর এবং ৮৭.৮ শতাংশ কিশোরী স্মার্টফোন ও সামাজিক মাধ্যমে সক্রিয়। এই বয়সিদের ৯০ শতাংশের বাড়িতে স্মার্টফোন আছে, তার মধ্যে ৪৩.৭ শতাংশ কিশোর ও ১৯.৭ শতাংশ কিশোরীর আছে নিজস্ব ফোন। দৈনন্দিন জীবনে এবং পড়াশুনার ক্ষেত্রেও কিছু কিছু কাজের জন্য এখন স্মার্টফোন অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। এই কিশোররা কি সেই কাজের জন্যই ফোনের দ্বারস্থ হচ্ছে? সমীক্ষা বলছে, না। এদের মাত্র ২৫ শতাংশ অনলাইনে জিনিস কেনা বা ফর্ম ফিল আপের মতো কাজে স্মার্টফোন ব্যবহার করে, ৮০ শতাংশই ফোন নিয়ে সিনেমা দেখা, গান শোনা বা অন্যান্য বিনোদনের জন্য ফোনে সময় কাটাচ্ছে। বিগত পনেরো-কুড়ি বছরে প্রযুক্তির বিস্ফোরণ এবং সমাজ কাঠামোয়, পরিবারের সমাজের বাঁধুনিতে, মানবিক সম্পর্কে যে পরিবর্তন এসেছে তার প্রভাবে আজ ছোটদের টিভি কিংবা মোবাইল দেখার নিয়ন্ত্রণ উঠে গেছে বললেই হয়। সুতরাং কোন সিনেমা, কোন গান তাদের দেখা বা শোনা উচিত এ সবের কোনও বালাই ছাড়াই ঘণ্টার পর ঘণ্টা মুঠোফোনে ডুবে থাকছে নবীন প্রজন্ম। সাইবার সুরক্ষার নিয়মবিধি না জেনে যথেচ্ছ ইন্টারনেট ব্যবহারের ফলে নানা প্রতারণা, ভয়ঙ্কর বিপদের ফাঁদেও পড়ছে অনেকে।

২০২৩-এর অন্য একটি সমীক্ষা দেখাচ্ছে, যেসব কিশোর-কিশোরী দিনে এক ঘণ্টা স্মার্টফোন ব্যবহার করে, তাদের তুলনায় যারা দিনে ৫ ঘণ্টা বা তার বেশি স্মার্টফোন ব্যবহার করে, তাদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা ৭১ শতাংশ বেশি। ১৮ থেকে ২৯ বছর বয়সিদের ২২ শতাংশ বলে, তারা কয়েক মিনিট পরপর ফোন না দেখে থাকতে পারে না। উঠে এসেছে অভিভাবকদের নিজেদের আসক্তির বিষয়টিও। ব্রিটিশ যুক্তরাজ্যের ৪৬ শতাংশ কিশোর-কিশোরী মনে করে, তারা স্মার্টফোনে আসক্ত এবং ৭১ শতাংশ মা-বাবা সন্তানের ডিজিটাল আসক্তির জন্য নিজেদের দায়ী মনে করছেন। নবীন প্রজন্মের একটা বড় অংশ বন্ধুদের সাথে গল্প করা, কারও সাথে দেখা করে সময় কাটানোর চেয়ে বেশি সময় কাটায় ফোনের পর্দায় বিভিন্ন ডিজিটাল মাধ্যমে চোখ রেখে, এখন যাকে বলা হয় 'স্ক্রিন টাইম'। বিজ্ঞানসম্মত পরীক্ষা-নিরীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, এই স্ক্রিন টাইম যত বাড়ছে, তত বাড়ছে দৃষ্টিশক্তি কমে যাওয়া, স্থূলতা, হজমের সমস্যা, মাথা যন্ত্রণা সহ নানা রোগ, অস্বাস্থ্যকর ফাস্টফুড খাওয়ার প্রবণতা এবং অবশ্যই মানসিক জটিলতা, অবসাদ, একাকীত্ব। ফেসবুক-ইউটিউব-টুইটার-ইন্সটাগ্রাম সহ নানা মাধ্যম চব্বিশ ঘণ্টা যে সমান্তরাল দুনিয়া তৈরি করে রাখছে, খুব সহজেই সেখানে ডুবে যাচ্ছে তরুণ মন। এই অভ্যাস ক্রমশ তার সামাজিক মনন, দিন-দুনিয়ার খবর রাখার ইচ্ছা, পাশের বাড়ির অসুস্থ মানুষটির খোঁজ নেওয়ার মনকে নষ্ট করে দিচ্ছে। এমনকি ব্লু-ফিল্ম, পর্নোগ্রাফির প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ছে একটা অংশ। কাজেই, স্মার্টফোনের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার সুস্থ-স্বাভাবিক মানুষ হয়ে ওঠার প্রক্রিয়ার যে সার্বিক ক্ষতি ডেকে আনছে, শুধু 'সাইবার নিরাপত্তা' শিখিয়ে তাকে আটকানো যাবে না।

বলা বাহুল্য, এ চিত্র শুধু আমাদের দেশের নয়। 'আর ইওর প্যারেন্টস অ্যাডিক্টেড টু ফোনস'? শিরোনামে নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকায় একটি প্রতিবেদন ২০১৯ সালের মে মাসে প্রকাশিত হয়। সান ফ্রান্সিসকো ভিত্তিক একটি সংস্থা ১০০০ জন মা-বাবা এবং তাঁদের সন্তানের ওপর একটি গবেষণা পরিচালনা করে। এতে বলা হয় যেখানে প্রতি ১০ জনে ৬ জন মা-বাবা মনে করেন, তাঁদের সন্তান মোবাইলে আসক্ত, সেখানে প্রতি ১০ জনে ৪ জন সন্তান মনে করে যে তাদের মা-বাবা মোবাইলে আসক্ত। জরিপে অংশ নেওয়া ৩৮ শতাংশ কিশোর বয়সী মনে করে, তাদের মা-বাবা মোবাইলে আসক্ত। শুধু তাই নয়, তারা তাদের মা-বাবার মোবাইল আসক্তি থেকে মুক্তি কামনা করে। এমনকি ৪৫ শতাংশ মা-বাবা নিজেরাই মনে করেন যে তাঁরা মোবাইলে আসক্ত। ২০২০-র ডিসেম্বরে জার্মানির হামবুর্গে একদল শিশু মা-বাবার মোবাইল আসক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদে রাস্তায় নেমে এসেছিল। আন্দোলনের নেতৃত্বে থাকা সাত বছর বয়সী এমিল বলে, 'তোমরা আমাদের সঙ্গে খেলো, স্মার্টফোনের সঙ্গে নয়।' (সূত্র ঃ প্রথম আলো)

করোনা অতিমারির সময় দীর্ঘকাল পঠন-পাঠন বন্ধ থাকার অজুহাতে শিক্ষাক্ষেত্রে অনলাইন ক্লাস শুরু করা হয়েছিল। দেশের একটা বিরাট অংশের ছাত্র-ছাত্রীর কাছে স্মার্টফোন ব্যবহারের সুযোগ না থাকা সত্ত্বেও এই ব্যবস্থা চালু হয় এবং বহু গরিব ছাত্রছাত্রী চিরকালের জন্য শিক্ষার অঙ্গন থেকে দূরে সরে যায়। বহু মা-বাবা কষ্ট করে ফোন কিনে দিতে বাধ্য হন। অতিমারির প্রকোপ একটু কমার সাথে সাথেই একটি দায়িত্বশীল সরকারের কাজ ছিল এই অনলাইন শিক্ষা বন্ধ করে যত দ্রুত সম্ভব ছাত্রছাত্রীদের ক্লাসমুখী করা, উপযুক্ত পরিকাঠামো গড়ে তুলে বেশি সংখ্যায় শিক্ষক নিযুক্ত করে পড়াশুনার এতদিনের ঘাটতি পূরণের ব্যবস্থা করা। অথচ সরকার সে পথে না গিয়ে এই অনলাইন শিক্ষাব্যবস্থাকেই গুরুত্ব দিল, তার হাত ধরে বাইজু-বেদান্ত-টিউটোপিয়ার মতো সংস্থাগুলো বিরাট ব্যবসা ফেঁদে বসল। শুধু তাই নয়, মাধ্যমিক উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের দশ হাজার টাকা দেওয়া হল বই কেনার জন্য নয়, স্মার্টফোন কেনার জন্য। রীতিমতো ফতোয়া জারি করে ফোনের বিল দেখানোর নিয়ম আনা হল, যাতে চাইলেও কেউ ওই টাকা অন্য খাতে খরচ করতে না পারে। পরিস্থিতি এমন দাঁড়ালো, চাইলেও মা-বাবা সন্তানকে ফোন না দিয়ে পারবেন না, তাতে তার যতই ক্ষতি হোক। বিজ্ঞানের আবিষ্কারের পথ ধরে যে ইন্টারনেট-স্মার্টফোন এসেছে, পড়াশুনার কাজে, নানা তথ্য সহজে জানার কাজে, গবেষণার জন্য তা নিশ্চয়ই সদর্থক ভাবে কাজে লাগানো যায়, কিন্তু তা কোনও দিন স্কুল-কলেজের ক্লাসরুমে শিক্ষকের কাছ থেকে নেওয়া জ্ঞানের বিকল্প হতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ একটি চমৎকার কথা বলেছিলেন —'ঘুরিয়া ফিরিয়া যেমন করিয়াই চলি না কেন শেষকালে এই অলঙ্ঘ্য সত্যে আসিয়া ঠেকিতেই হয় যে, শিক্ষকের দ্বারাই শিক্ষাবিধান হয়, প্রণালীর দ্বারা হয় না।'

মানুষের স্মার্টফোনে আসক্তি কমে গেলে, ভোগ্যপণ্যের বাজার পড়ে গেলে বড় বড় একচেটিয়া পুঁজিপতিদের লাভের অঙ্কেও টান পড়বে। গুগল-টুইটার-হোয়াটসঅ্যাপ ইত্যাদি সংস্থা লাভের অঙ্ক ক্রমাগত বাড়িয়ে যেতে পারবে না। বাজার তাই মানুষের এই আসক্তিতে ক্রমাগত ইন্ধন জোগায়। তাকে বোঝায়, খেতে পাও বা না পাও একটা দামি ফোন না থাকলে, নিয়মিত সমাজমাধ্যমে আপডেট না দিতে পারলে তোমার মানসম্মান রইল না। কাগজপত্রে এর ক্ষতি নিয়ে লেখালিখি হয় ঠিকই, কিন্তু সেখানে স্বভাবতই বিষয়টিকে দেখানো হয় ব্যক্তির অভ্যাস, অসচেতনতার নিরিখে। এই অভ্যাস বা আসক্তি গড়ে ওঠার আঁতুড়ঘর যে আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা, স্বভাবতই সে দিকটি সযত্নে এড়িয়ে যাওয়া হয়।

এই সর্বনাশা স্মার্টফোন-আসক্তি সম্পর্কে সর্বস্তরের মানুষের সচেতন চেষ্টা প্রয়োজন, খেলার মাঠ-গল্পের বই-পাড়া প্রতিবেশীর সাহচর্যের মতো হারিয়ে যাওয়া জিনিসগুলোও শিশু-কিশোরদের পৃথিবীতে যতটা সম্ভব ফিরিয়ে আনা দরকার। আবার মনে রাখা দরকার, এটি কোনও ব্যক্তির সমস্যা নয় বা প্রযুক্তির অগ্রগতি এর জন্য দায়ী নয়। মুনাফাসর্বস্ব যে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা মানুষের সমস্ত বিকাশের পথ রুদ্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে, মানুষকে সমাজবিচ্ছিন্ন করতে, তরুণ প্রজন্মের মনুষ্যত্ব ধ্বংস করতে সে সদা সচেষ্ট। বিজ্ঞানের আবিষ্কার বা প্রযুক্তির অগ্রগতি মানুষের জীবনকে সুন্দর উন্নত করবে নাকি সে প্রযুক্তির দাসত্ব করবে, তা ঠিক করে এই ব্যবস্থাই।

পৌর সমস্যা সমাধানের দাবি আগরতলায়

বিজেপির 'ডবল ইঞ্জিন' রাজ্য ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলার নাগরিকরা ন্যূনতম পৌর পরিষেবা থেকেও বঞ্চিত। মশার উপদ্রব মাত্রাছাড়া। মশা নিয়ন্ত্রণে আগরতলা পৌরসভার কোনও উদ্যোগ নেই।

পানীয় জলের সংকট পুরনো আগরতলা শহর সহ বর্ধিত এলাকাগুলিতে ভয়াবহ হয়ে উঠেছে। এ ছাড়াও স্ট্রিট লাইট, ড্রেন ইত্যাদির হাল শোচনীয়। বর্জ্য সংগ্রহ ও তার ব্যবস্থাপনার কোনও চিহ্ন নেই। অন্যান্য পৌর পরিষেবার ক্ষেত্রে জন্ম-মৃত্যুর সার্টিফিকেট, মিউটেশন ইত্যাদি পেতে চরম হয়রানির শিকার নাগরিকরা। পৌরসভা তার বহু কাজ আউটসোর্সিং করে বেসরকারি এজেন্সিকে দেওয়ায় হয়রানি আরও বাড়ছে।

এই সমস্ত সমস্যাগুলি সমাধানের দাবিতে ২৪ মে আগরতলার সিটি সেন্টারে বিক্ষোভ দেখাল এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)। মেয়রের কাছে নাগরিক দাবি সংবলিত স্মারকলিপি দেন দলের আগরতলা জেলা সম্পাদক সুব্রত চক্রবর্তীর নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল।

পাঠকের মতামত

ভোটে সুবিধা পেতে জাত-পাত বিভাজনের রাজনীতি চলছেই

ভোটের ফলাফলের পর কেউ কেউ বলেছেন, হিন্দুরাই হিন্দুদের উপকার চায় না। একজন 'ঈশ্বরের দূত' এই দেশে এসেছেন হিন্দুদের এই সংকটময় অবস্থা থেকে উদ্ধার করতে। কিন্তু হিন্দুরা তাঁকে চিনতেই পারল না।

জানতে ইচ্ছে করে এই দশ বছরে ক'হাজার হিন্দুর চাকরি জুটেছে? মূল্যবৃদ্ধির আঁচ থেকে হিন্দুরা পরিত্রাণ পেয়েছে? চিকিৎসা করাতে হিন্দুরা বিশেষ সুযোগ-সুবিধা পেয়েছে? এখন তো টিবির ওষুধটাও হাসপাতাল থেকে দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে!

ভোটে সুবিধা পাওয়ার জন্য অসম্পূর্ণ অবস্থায় রাম মন্দিরে রামকে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। একটা ইনকমপ্লিট ফ্ল্যাটে কেউ কি গিয়ে ওঠে, খুব বেকায়দায় না পড়লে? গোটা দেশ জুড়ে এমনকি বাংলায় যেভাবে ধর্মীয় মেরুকরণের তাস খেলা হল তা অতি আতঙ্কের। দেশের বাইরে থেকে আসা অ-মুসলিমরাই একমাত্র নাগরিকত্ব পাবে— এ কথা বলে বিজেপি যেমন হিন্দুভোট টানার চেষ্টা করেছে, তেমনই বিজেপির ভয় দেখিয়ে টিএমসি মুসলিম ভোট এক জায়গায় আনার চেষ্টা করেছে। এই খেলায় জোটপ্রার্থীরাও অংশগ্রহণ করেছে।

ভোটের জন্য যেভাবে মানুষকে মানুষের পর্যায় থেকে নামিয়ে জাতপাতভিত্তিক ভোটারে পরিণত করার চেষ্টা হচ্ছে, তা ভয়ঙ্কর সামাজিক অস্থিরতা সৃষ্টি করবে।

গৌতম দাস, মালদহ

নিট দুর্নীতি ঃ সারা ভারত প্রতিবাদ দিবসের ডাক এআইডিএসও-র

নিট-ইউজি পরীক্ষায় চূড়ান্ত দুর্নীতির প্রতিবাদে ৮ জুন এআইডিএসও-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে নিট কেলেঙ্কারির বিচার বিভাগীয় তদন্ত এবং অবিলম্বে দোষীদের শাস্তির দাবিতে কলকাতায় একটি বিক্ষোভ মিছিল হয়।

একইসঙ্গে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশের এক মাস পর এখনও কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু না হওয়ার প্রতিবাদ জানিয়ে অবিলম্বে ভর্তি প্রক্রিয়া চালুর দাবি করা হয়।

কলকাতা মেডিকেল কলেজ থেকে শুরু হয়ে ছাত্রছাত্রীদের এই মিছিল কলেজ স্ট্রিট কফি হাউসের সামনে পৌঁছলে সেখানে একটি সভা হয়। বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য গৌরাঙ্গ খাটুয়া এবং ডাঃ অনুপম ভট্টাচার্য।

ইতিমধ্যেই নিট-ইউজি কেলেঙ্কারির প্রতিবাদে তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলতে এআইডিএসও-র সর্বভারতীয় কমিটির পক্ষ থেকে দেশ জুড়ে অনলাইন স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান শুরু হয়েছে এবং ১০ জুন সারা ভারত প্রতিবাদ দিবসের ডাক দেওয়া হয়েছে। এআইডিএসও-র নেতৃত্বে এই সর্বব্যাপক দুর্নীতির বিরুদ্ধে দেশব্যাপী ছাত্র আন্দোলনে সামিল হওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে।

জীবনাবসান

এস ইউ সি আই (সি) পুরুলিয়া উত্তর সাংগঠনিক জেলা কমিটির অন্তর্গত আদ্রা লোকাল কমিটির আবেদনকারী সদস্য, দলের কর্মী-সমর্থকদের অত্যন্ত প্রিয় কমরেড সত্যনারায়ণ রায় (এস এন রায় নামে পরিচিত) দীর্ঘ রোগভোগের পর ২২ এপ্রিল শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৮২ বছর। তিনি ষাটের দশকে রেলের চাকরিসূত্রে গ্রামের বাড়ি ছেড়ে অনাড়াতে বসবাস শুরু করেন। সেই সময় কমরেড কানাইলাল ব্যানার্জী এবং কমরেড কৃষ্ণদেব গোস্বামী সেখানে রেল ইউনিয়ন গড়ে তুলছিলেন। তাঁদের মাধ্যমেই কমরেড রায় এই ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত হয়ে রেল কর্মচারীদের বিভিন্ন দাবি-দাওয়ার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা আন্দোলনে যুক্ত হন। এরই ধারাবাহিকতায় তিনি কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার সংস্পর্শে আসেন এবং নিজেকে দলের একজন সংগঠকে পরিণত করেন ও পূর্বতন পুরুলিয়া জেলা কমিটির সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন।

পরে চাকরিতে বদলি হয়ে তিনি আদ্রাতে আসেন এবং দলের কাজ শুরু করেন। বিভিন্ন গণআন্দোলন, বিদ্যুৎগ্রাহক আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। অবসর নেওয়ার পরেও তিনি দলের কাজে যুক্ত ছিলেন। পরে শারীরিক অসুস্থতার কারণে সক্রিয় ভাবে সংগঠনের কাজ করতে না পারা নিয়ে তাঁর মানসিক যন্ত্রণা ছিল।

তাঁর মৃত্যুসংবাদ পেয়ে এলাকার কর্মীরা এবং প্রতিবেশী ও আত্মীয়স্বজনরা উপস্থিত হন এবং শ্রদ্ধা জানান। দলের পক্ষ থেকে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান পুরুলিয়া উত্তর সাংগঠনিক জেলা কমিটির সম্পাদক কমরেড লক্ষ্মীনারায়ণ সিনহা এবং কমরেড সুনীতি ভট্টাচার্য সহ জেলা নেতৃবৃন্দ। তাঁর মৃত্যুতে দল হারাল একজন দক্ষ সংগঠককে।

কমরেড সত্যনারায়ণ রায় লাল সেলাম

লাদাখবাসীর অনন্য লড়াই

তিনের পাতার পর

কিনতে পারত না, কিন্তু আজ বহু দূর থেকে আসা বহু টাকার মালিকরা লাদাখবাসীদের হটিয়ে জমির দখল নিচ্ছে। ব্যবসা-বাণিজ্য ক্রমে বাইরের লোকের হাতে চলে যাচ্ছে। পর্যটন শিল্পের চাপে পরিবেশ ধ্বংস হচ্ছে। বলিউডের অপসংস্কৃতির চাপে তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি বিপন্ন হচ্ছে। ফলে অর্থনীতি-সংস্কৃতি আজ প্রবল সঙ্কটে। আজ তাই তারা তাদের হৃত অধিকারের দাবিতে সোচ্চার।

প্রাকৃতিক পরিবেশ বিপন্ন

লাদাখের সব থেকে বড় সমস্যা হল সেখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশ ধারাবাহিকভাবে ধ্বংস হচ্ছে। এর কারণ দুটি। প্রথমটি, প্রকৃতিকে অগ্রাহ্য করে পর্যটন ব্যবসা। দ্বিতীয়টি হল লাদাখের মাটি খুঁড়ে খনিজ সম্পদ উত্তোলন। এছাড়া রয়েছে নদীতে বাঁধ দিয়ে জলবিদ্যুৎ তৈরি করা। গত কয়েক বছরে লাদাখে পর্যটকদের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপেয়েছে। এতে স্থানীয় দোকানদার, হোটেল ব্যবসায়ীরা কিছুটা লাভবান হয়েছেন, কিন্তু পরিবেশ ধ্বংস হয়েছে বহুল পরিমাণে। এমনিতেই এখানকার খাদ্য, পানীয় জল, কৃষিজ সম্পদ কম। ফলে পর্যটকদের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ না করলে এবং ক্ষয়ক্ষতি নিরাময়ে সরকারের তরফে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ না করলে সংকট আরও ঘনীভূত হবে।

সমীক্ষা অনুসারে লাদাখে বেড়াতে আসা একজন পর্যটক দৈনিক ১.৩৮ কেজি কঠিন বর্জ্য পদার্থ পরিত্যাগ করেন (সূত্র ঃ ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট ইন কোল্ড ডেসার্ট, এ কেস স্টাডি অফ লেহ ডিস্ট্রিক্ট, জে অ্যান্ড কে, ইন্ডিয়া)। প্লাস্টিক দূষণের পরিমাণও মারাত্মক। প্রতি বছর ৫০ টন প্লাস্টিক জমছে লাদাখের মাটিতে (সূত্র ঃ হেলেনা নরবার্গ-হজ, লাদাখ ব্যালেন্সিং ট্যুরিজম উইথ ট্র্যাডিশন)। ফলে পরিবেশের সমূহ ক্ষতি হচ্ছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বিশ্ব-উষ্ণায়নের কুফল। তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে বিপজ্জনকভাবে লাদাখের হিমবাহ গলছে। এর ফলে জলসংকট দেখা যাচ্ছে, লাদাখের কৃষিকাজে যার বিরূপ প্রভাব পড়ছে। পরিবেশ-বিজ্ঞানীরা বলছেন, এমন চলতে থাকলে লাদাখ অচিরেই শীতল সাদা মরুভূমিতে পরিণত হবে।

এর পাশাপাশি নগরায়নের ফলে লাদাখের অরণ্য ধ্বংস হচ্ছে। এমনিতেই এই অঞ্চলে অরণ্যের পরিমাণ মোট জমির মাত্র ৫ শতাংশ। সেই স্বল্প অরণ্যও নগরায়ন, হোটেল নির্মাণ, রাস্তা নির্মাণের জন্য এখন কেটে সাফ করা হচ্ছে। রাজধানী লেহ শহর বা অন্যত্র এই ধ্বংসযজ্ঞ চলেছে। গাছ কেটে ফেলার ফলে ভূমিক্ষয়ের আশঙ্কাও বাড়ছে। এর ফলে লাদাখে যেটুকু সবুজ আবরণ ছিল, তাও বিনষ্ট হচ্ছে।

ষষ্ঠ তফসিল থেকেও বঞ্চিত করা হল

সংবিধানের ষষ্ঠ তফসিলে উত্তর-পূর্ব ভারতের চারটি রাজ্য— আসাম, মেঘালয়, ত্রিপুরা এবং মিজোরামের আদিবাসী অঞ্চলে বিশেষ প্রশাসনিক ব্যবস্থার সুযোগ রাখা হয়েছে। অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল (এডিসি) বা অটোনমাস রিজিওনাল কাউন্সিল (এআরসি) -র মাধ্যমে ওই আপেক্ষিক স্বায়ত্তশাসনের সুযোগ দেওয়া হয়েছে ওই রাজ্যগুলিতে। ষষ্ঠ তফসিলের মাধ্যমে লাদাখের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের নিজস্বতা বজায় রাখা যেত এবং ভঙ্গিল পরিবেশকে কিছুটা সুরক্ষা দেওয়া যেত। ষষ্ঠ তফসিলের মাধ্যমে লাদাখবাসিরা তাদের ভাষা, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, রীতিনীতিকে রক্ষা করতে পারতেন বলে তাঁরা মনে করেন। লাদাখকে সংবিধানের ষষ্ঠ তফসিলের অন্তর্ভুক্ত করা হলে সেখানে এডিসি এবং এআরসি গঠন করা যেত এবং ওই নির্বাচিত বডিগুলি প্রয়োজনে বিভিন্ন বিষয়ে আইন প্রণয়ন করতে পারত।

তাছাড়া, ষষ্ঠ তফসিলের অন্তর্ভুক্ত হলে বাইরের সাংস্কৃতিক আগ্রাসন থেকে নিজেদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে রক্ষা করার জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক বরাদ্দ পাওয়া যেত। স্বায়ত্তশাসন এবং আর্থিক সহযোগিতা লাদাখের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধিতে সাহায্য করত বলে লাদাখ আন্দোলনের প্রবক্তারা মনে করেন। কিন্তু কেন্দ্রের বিজেপি সরকার তাতে কর্ণপাত করছে না।

বিজেপি সরকার উদাসীন

লাদাখের মানুষের এত বড় আন্দোলন সত্ত্বেও বিজেপি-পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকার নীরব রয়েছে। তাদের এই মৌনব্রত ধারণের কারণ কী? আসলে কেবলমাত্র বৌদ্ধ বা মুসলমান নয়, লাদাখের সকল মানুষের উত্থাপিত দাবিগুলি জম্মু-কাশ্মীরের বিভাজন, তার বিশেষ মর্যাদা খারিজ করা, ৩৫-ক ধারা বিলোপ করা ইত্যাদির বিরোধী। দাবি মানতে হলে লাদাখকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হওয়া সত্ত্বেও বিশেষ সুবিধা দিতে হয়। কিন্তু তাতে জম্মু-কাশ্মীরের বিশেষ সুবিধা খারিজ করার বিষয়টিও বাতিল করতে হয়! দ্বিতীয়তঃ, লাদাখের কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে চাকরি এবং জমির বিষয়ে বিশেষ সুবিধা দিলে, জম্মু-কাশ্মীরেও তার দাবি উঠবে। সেটা বিজেপি সরকার আদৌ চায় না। সুতরাং আন্দোলন স্তিমিত করার জন্য তারা ধর্মীয় বিভাজন সৃষ্টি করার চক্রান্ত করছে। বৌদ্ধ এবং মুসলিমদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিভাজন ঘটিয়ে লাদাখের আন্দোলন চাপা দেওয়ার ছক কষছে তারা।

সর্বশেষ পরিস্থিতি

প্রবল প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যেও যেভাবে লাদাখের মানুষ বিক্ষোভ দেখিয়েছেন, সেটা কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে তাদের তীব্র বিক্ষোভের সাক্ষ্য দেয়। ২০২৪-এর ৬ মার্চ থেকে সোনম ওয়াংচুক ২১ দিনের অনশন বিক্ষোভ শুরু করেন। বরফাবৃত রাস্তায় তাঁবুর মধ্যে শুয়ে তুষারপাতের মধ্যেও তাঁর এই অনশন দেশের বিবেকবান মানুষকে নাড়া দিয়েছে। হাজারে হাজারে পরিবেশ ও বিজ্ঞানকর্মী দেশ জুড়ে এই আন্দোলনের সমর্থনে পথে নেমেছেন। আন্তর্জাতিক স্তরেও এই আন্দোলন সমর্থন পেয়েছে। ২৬ মার্চ অনশন শেষ হলেও সোনম ওয়াংচুক এবং তাঁর সহকর্মীরা জানিয়েছেন দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে। সংবাদমাধ্যমে এই আন্দোলনের যেটুকু খবর প্রকাশিত হয়েছে, সেটা খুবই আশাব্যঞ্জক। এই দেশের গণতন্ত্রপ্রিয় এবং পরিবেশ-সংকট নিয়ে সক্রিয় সকল মানুষের লাদাখের আন্দোলনকারীদের প্রতি সংহতি, সমর্থনে এই আন্দোলন আরও তীব্র হয়ে উঠবে।

এ-পার কাশ্মীরের মতো ও-পারেও সরকারের হাতিয়ার শুধু দমন-পীড়ন

'নদীর এ-পার কহে ছাড়িয়া নিঃশ্বাস, ও-পারেতে সর্বসুখ আমার বিশ্বাস।'

কোন পার ভাল আছে কাশ্মীরের? ভারতভুক্ত কাশ্মীর, না কি পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীর?

গত এপ্রিল এবং মে মাসে একাধিকবার পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরে বিক্ষোভে ফেটে পড়েছেন সাধারণ মানুষ। দাবি তাঁদের অতি সাধারণ, জিনিসপত্রের দাম কমাতে হবে, বিশেষত গম এবং বিদ্যুতের বর্ধিত দাম প্রত্যাহার করতে হবে। কিন্তু এই নিতান্ত গণতান্ত্রিক দাবিও মানতে নারাজ সেখানকার সরকার। আন্দোলনের ওপর পুলিশের অত্যাচারে ইতিমধ্যেই অন্তত চারজনের মৃত্যু ঘটেছে। আহত এবং গ্রেপ্তারের সংখ্যা বহু। পুলিশ বাড়ি বাড়ি তল্লাশি চালিয়ে আন্দোলনের নেতাদের গ্রেপ্তার করেও তা দমন করতে পারেনি। অবশেষে আন্দোলনের চাপে পাক অধিকৃত কাশ্মীরের সরকার বিদ্যুতের দামে কিছু ছাড়ের ঘোষণাও করেছে।

এর পরেও ক্ষোভে ফুঁসছেন এই অংশের মানুষ। গত বছর আগস্টেও একই রকম আন্দোলন সেখানে ছড়িয়ে পড়েছিল। অসংখ্য বঞ্চনা, শোষণ, জুলুমের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে তাঁদের দিন কাটে। স্বশাসনের অধিকার, সাংস্কৃতিক-সামাজিক বৈশিষ্ট্য রক্ষার অধিকার, মত প্রকাশের অধিকার, খেয়ে-পরে সুষ্ঠুভাবে বাঁচার মতো রোজগারের অধিকার সবই তাঁদের কাছে অধরা। কেন্দ্রীয় পাকিস্তান সরকার কিংবা পাক অধিকৃত কাশ্মীরের প্রাদেশিক সরকার— কোনও বুর্জোয়া সরকারই সাধারণ মানুষের অধিকারের তোয়াক্কা করে না। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি রদ করা, কর্মসংস্থান ইত্যাদি র দাবির সাথে যুক্ত হয়ে যাচ্ছে মানুষের অন্যান্য অধিকারের প্রশ্নগুলি।

এ দিকে ভারতভুক্ত কাশ্মীরে কেমন আছে জনগণ? ১৯৯০-এর দশকে গোটা জম্মু-কাশ্মীর জুড়ে যে রক্তক্ষয়ী আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল ঘটনাচক্রে তারও দাবি ছিল বিদ্যুতের দাম কমানো, লোডশেডিং বন্ধ, দ্রব্যমূল্য হ্রাস, আপেল সহ সমস্ত বাগিচা ফসলের যথাযথ দামের ব্যবস্থা, বেকারদের জন্য কাজ, সমস্ত পরিবারগুলির রোজগারের বন্দোবস্ত ইত্যাদি। সেদিন জম্মু-কাশ্মীর ও কেন্দ্রের সরকার জনগণের দাবি শোনার বদলে সামরিক বাহিনীর অস্ত্রের জোরেই আন্দোলন দমন করে দেবে ভেবেছিল। তার ফল হয়েছিল মারাত্মক। জনগণের প্রতি সরকারের চরম নিপীড়নমূলক মনোভাবের সুযোগে শক্তি সঞ্চয় করেছিল বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলি। পুরো উপত্যকা জুড়ে তীব্র জনরোষ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পথ ছেড়ে সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীগুলির হাতে শক্তি জুগিয়েছিল। বলা বাহুল্য, এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল জনগণের দাবির প্রতি চরম উপেক্ষার কারণেই।

কাশ্মীরের ভারতভুক্তির সময় সংবিধানের ৩৭০ ধারার মধ্য দিয়ে সে রাজ্যের মানুষের কিছু বিশেষ অধিকার সুনিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল ভারত সরকার। আজ সে অধিকার লোপ করে দিয়েছে মোদি সরকার। কাশ্মীর এখন কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন, দীর্ঘকাল কোনও নির্বাচিত রাজ্য বিধানসভাও নেই। সে রাজ্য আজ ভুগছে চরম বেকারত্বের জ্বালায়। নেই ফসল বাজারজাত করার পরিকাঠামো, ফসলের ন্যায্য দাম। বিদ্যুতের দাম বাড়ছে অথচ দীর্ঘ সময় লোডশেডিং প্রতিদিনের ঘটনা। এই সমস্যাগুলির কোনওটির দিকেই কেন্দ্রীয় সরকারের বিশেষ নজর নেই। কাশ্মীরের মানুষের মত প্রকাশের অধিকার চরমভাবে পদদলিত, প্রতিষ্ঠিত সাংবাদিকরা পর্যন্ত সরকারের সামান্য সমালোচনা করলেই জেল, নির্যাতনের সামনে পড়ছেন। স্বাভাবিক জীবনযাত্রা কাকে বলে তা বহুকাল হল কাশ্মীরের মানুষ যেন ভুলেই গেছেন। রাস্তায় বেরোলেই তল্লাশির সামনে তাঁদের পড়তেই হবে। এত নিরাপত্তা বাহিনী থেকেও সাধারণ মানুষের কোনও নিরাপত্তা নেই বললেই চলে। যখন তখন ইন্টারনেট থেকে শুরু করে ফোনের নেটওয়ার্ক বন্ধ করে দেওয়া কাশ্মীরের মানুষের জীবনে যেন স্বাভাবিক ঘটনা।

এর মধ্যেই দিল্লি থেকে বিজেপি সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক জানিয়ে দিয়েছে কাশ্মীরে কারও বাবা অথবা মায়ের পরিবারের কোনও আত্মীয়ের বিরুদ্ধে জঙ্গি যোগের সামান্য অভিযোগ থাকলেই সেই পরিবারের কেউই কোনও দিন সরকারি চাকরির জন্য আবেদনই করতে পারবেন না। এমনকি কেউ যদি সরকার বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনে নেমে থাকে সেটাও হবে তার দূর সম্পর্কের আত্মীয়দের ক্ষেত্রে পর্যন্ত সরকারি চাকরি পাওয়ার ক্ষেত্রে বাধা। কোনও মিছিল থেকে পুলিশের দিকে পাথর ছোঁড়ার অভিযোগকেও সন্ত্রাসবাদের সাথে এক করে দেখানো হয়েছে। বাস্তবে কাশ্মীর উপত্যকা জুড়ে এমন পরিবার বিরল যার কোনও না কোনও আত্মীয়ের বিরুদ্ধে এই ধরনের কোনও মামলা নেই। ঘটনা হল বহু ক্ষেত্রে উচ্চ আদালত পর্যন্ত স্বীকার করেছে এই সব মামলার অনেকগুলিই ভুয়ো অভিযোগে করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের এই পদক্ষেপ অনেকটা ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ সরকারের চালু করা পিটুনি করের মতো। একজনের অপরাধে তার সমগ্র পরিবার ও আত্মীয়দের শাস্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত কোন ধরনের গণতান্ত্রিক আইন? ন্যায়বিচারের কথা যদি ছেড়েও দেওয়া হয়, একটা দেশের সরকার তার নাগরিকদের ওপর এই রকম একটা ফতোয়া চাপিয়ে দিচ্ছে— সভ্য দুনিয়ায় এমন উদাহরণ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। বাস্তবে কেন্দ্রীয় সরকারের এই সিদ্ধান্ত কাশ্মীরের জনগণকে নতুন করে আঘাত দেবে, যা বিচ্ছিন্নতাবোধ বাড়তেই সাহায্য করবে। এখন দরকার কাশ্মীরের যুব সমাজের কর্মসংস্থানে সরকারের আন্তরিকতা। দরকার সন্ত্রাসবাদ, বিচ্ছিন্নতাবাদের হাত থেকে তাদের মুক্ত করার জন্য বিশ্বাস অর্জন করা। এর জন্য প্রয়োজন সরকারের জনমুখী দৃষ্টিভঙ্গি। এর মধ্য দিয়েই একমাত্র সরকার জনজীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলি সমাধানে কার্যকরী ব্যবস্থা নিতে পারে। কিন্তু বিজেপি সহ যে কোনও শাসক দলের কাছ থেকেই তা আশা করা বৃথা। তারা শাসন করা বলতে বোঝে গায়ের জোরের সামনে মানুষকে নত রাখা, যাতে কেউ শোষণের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুলতে না পারে। মহান সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ব্রিটিশ শাসকদের দেখে বলেছিলেন, শোষণের জন্যই শাসন, না হলে তার অন্য কোনও প্রয়োজন নেই। আজ ভারত সরকারকে দেখলে বোঝা যায় শাসকের চরিত্র বদলায়নি।

কাশ্মীরের মানুষের ওপর রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন দেখে কেউ কেউ এই রাজ্যকে স্বাধীন করার কথা ভাবেন, কেউ আবার কাশ্মীরের মানুষের ক্ষোভ দেখে মনে করেন গায়ের জোরে কাশ্মীরকে দাবিয়ে রাখলেই সমস্যার সমাধান হবে। বিজেপির প্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে ভারতীয় নাগরিকদের একটা অংশ মনে করেন, কাশ্মীরের মানুষ বোধহয় পাকিস্তানের প্রতি সহানভূতিশীল। কিন্তু পাক অধিকৃত কাশ্মীরের জনগণের ওপর পাকিস্তান প্রশাসনের দমন-পীড়ন দেখিয়ে দিচ্ছে বাস্তবে তেমন ভাবার কোনও কারণ নেই। এটা আসলে বিজেপি আরএসএস-এর কল্পিত অপপ্রচার ছাড়া কিছু নয়।

কাশ্মীরের ভারতভুক্তির দাবি সবচেয়ে বেশি করে তুলেছিল কাশ্মীরের জনগণ। কিন্তু পরবর্তীকালে কংগ্রেস-বিজেপির মতো শাসকদলগুলির ভূমিকাই সেখানে বিচ্ছিন্নতাবাদের জমি তৈরিতে সাহায্য করেছে। ১৯৫০ সালে মুম্বইয়ের 'কারেন্ট' পত্রিকায় ঔপন্যাসিক ও চিত্রনাট্যকার খাজা মহম্মদ আব্বাস লিখেছিলেন, ভারত সরকার যদি কাশ্মীরের মন জয় করতে চায়, তাহলে নীতিনিষ্ঠভাবে ধর্মনিরপেক্ষতা বজায় রেখে জনমুখী অর্থনৈতিক কর্মসূচি তাদের আঁকড়ে ধরতে হবে (সূত্রঃ গান্ধী উত্তর ভারত, রামচন্দ্র গুহ)। ঠিক এই কাজটাই কোনও সরকার করেনি।

বোঝা দরকার, তথাকথিত স্বাধীন কাশ্মীর, পাক অধিকৃত কাশ্মীর কিংবা ভারতভুক্ত কাশ্মীর যেটাই হোক না কেন, বুর্জোয়া শ্রেণির একটি দল বা তাদেরই জোট শাসন চালালে তা পরিচালিত হবে বুর্জোয়া শাসকদেরই স্বার্থে। তাতে জনসাধারণের ওপর জুলুম, তাদের শোষণ করার কাজটা একই রকম হয়। সে কারণেই পাক অধিকৃত কাশ্মীরে উপজাতি, ভাষা পরিচয় নির্বিশেষে সাধারণ মানুষের ওপর সে দেশের কেন্দ্রীয় সরকার এবং প্রাদেশিক সরকার জুলুম চালায়। পাক অধিকৃত কাশ্মীরের কোনও প্রতিনিধি পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সংসদে না থাকায় কেন্দ্রের সিদ্ধান্ত তাদের ওপর রাষ্ট্র চাপিয়ে দেয়। অনেকটা একই কায়দায় কাশ্মীরের মানুষের অধিকার কেড়ে নেওয়ার সময় ভারত সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের বসানো লেফটেন্যান্ট গভর্নরকেই কাশ্মীরের জনগণের প্রতিনিধি সাজিয়ে দেয়। কাশ্মীরের মানুষের কোনও মতামত নেওয়ার তোয়াক্কাই কখনও কোনও কেন্দ্রীয় সরকার করেনি, আজও বিজেপি তা করছে না। বোঝা দরকার, ভারতের বিপুল সংখ্যার খেটে খাওয়া মানুষের সমস্যার সাথে কাশ্মীরের মানুষের মূলগত কোনও পার্থক্য নেই। এই সত্যটা সে রাজ্যের মানুষের কাছে স্পষ্টভাবে তুলে ধরতে গেলে তাদের ন্যায্য অধিকারের দাবির পাশে দাঁড়িয়ে গড়ে তুলতে হবে গণআন্দোলন। অন্যান্য রাজ্যের খেটে-খাওয়া মানুষের দাবি নিয়ে গণআন্দোলনের মধ্যেও কাশ্মীরের মানুষের ওপর সরকার ও বুর্জোয়া শ্রেণির জুলুমের কথা তুলে ধরতে হবে। একমাত্র এই পথেই গড়ে উঠতে পারে ভারতের সমগ্র খেটে-খাওয়া জনগণের সাথে কাশ্মীরের জনগণের ঐক্য। বিজেপি নেতারা নিজেদের ভোটব্যাঙ্কের স্বার্থে মাঝে মাঝে সামরিক তাকতের জোরে পাক অধিকৃত কাশ্মীরকে ফিরিয়ে আনার হুঙ্কার দেন। যদিও সে অংশের জনগণের আস্থা অর্জনের পথও হল একমাত্র খেটে-খাওয়া মানুষের ঐক্য। যে ঐক্য সম্পূর্ণভাবে অর্জিত হতে পারে একমাত্র শোষিত-মেহনতি মানুষের স্বার্থ রক্ষাকারী সমাজেই।

ভারত কিংবা পাকিস্তান কাশ্মীরের উভয় অংশের মেহনতি জনগণ নিজেদের শ্রেণিগত প্রকৃত স্বার্থ নিয়ে উঠে দাঁড়ালেই একমাত্র এই ঐক্য অর্জিত হতে পারে।

বিশ্ব পরিবেশ দিবসে পদযাত্রা ও বিক্ষোভ

৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে পরিবেশ সচেতনতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে পূর্ব মেদিনীপুরে মেচেদা কেন্দ্রীয় বাসস্ট্যান্ডে ক্ষুদিরাম মূর্তির পাদদেশ থেকে কোলাঘাট তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের মুল ফটক পর্যন্ত পদযাত্রা হয়। পাঁচমাথার মোড় ও থার্মাল গেটে পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন কোলাঘাট তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ কমিটির সহসভাপতি ডাঃ বিশ্বনাথ পড়িয়া, মুখপাত্র নারায়ণ চন্দ্র নায়ক, সহসম্পাদক ডাঃ কালীশংকর পাত্র প্রমুখ।

মেচেদায় তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে যে ভয়াবহ দূষণ ছড়াচ্ছিল, আন্দোলনের মাধ্যমে তা অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণ করা গেলেও এখনও এলাকার কোথাও আবর্জনা ফেলার ভ্যাট না থাকায় প্রতিদিন ভয়াবহ দূষণ ছড়াচ্ছে। মেচেদা-বাঁপুর ও দেনান খালে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের ছাই-জল ফেলার কারণে তা মজে গিয়ে জলনিকাশী সমস্যা তীব্রতর হচ্ছে। সংগঠনের পক্ষ থেকে অবিলম্বে দূষণ প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার দাবি জানানো হয়।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2022-24

গণদাবী GANADABI Volume: 76, No.: 43 Bengali Weekly June 14, 2024 Kolkata Price: Rs. 3.00

হিন্দু বা মুসলিম নয়, বেকার সব ঘরে

গ্রাম, শহর সর্বত্র কর্মসংস্থানের সমস্যাটি সরকারের বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে উঠে এসেছে।

বেকারত্বের মতো জনজীবনের এক মারাত্মক সঙ্কট সমাধানের কোনও সুনির্দিষ্ট রূপরেখা কি বিজেপি কিংবা কংগ্রেস— এই দুই জোটের আছে? দেশের চাকরির সঙ্কট যত বাড়ছে, এরা সমস্যার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধানের পরিবর্তে নানা বিভ্রান্তির বিষয় এনে মানুষের দৃষ্টিকে ঘুলিয়ে দিচ্ছে। যেমন বিজেপি ভোটের সময় প্রচার করেছে দেশে বিভিন্ন অ-বিজেপি সরকারের তোষণের জন্য মুসলিমরা চাকরির সুযোগ হিন্দুদের তুলনায় বেশি পেয়ে যাচ্ছে। যেন হিন্দুদের চাকরি না হওয়ার জন্য দায়ী মুসলিমরা! কেউ কেউ এসব কথায় বিভ্রান্তও হচ্ছেন।

চাকরির দাবিতে এআইডিওয়াইও-র বিক্ষোভ। ফাইল চিত্র

দেশে চাকরির বাস্তব চিত্রটি কী? ভারতে হিন্দুদের মধ্যে চাকরির হার কেমন? মুসলিমদের মধ্যে চাকরির হার হিন্দুদের তুলনায় কম না বেশি? খ্রিস্টান, শিখ, বৌদ্ধদের মধ্যেই বা চাকরির হার কেমন? এই সমস্ত প্রশ্নের তথ্যনিষ্ঠ উত্তর সম্প্রতি প্রকাশ করেছে গবেষণা-সংস্থা লোকনীতি-সিএসডিএস। সেই তথ্য বিশ্লেষণের সুবিধার্থে বেকারত্বের হার, চাকরির হার, লেবার ফোর্স পার্টিসিপেশন রেট কী এবং কীভাবে বা এসব পরিমাপ করা হয় তা দেখে নেওয়া দরকার। লেবার ফোর্স পার্টিসিপেশন রেট কী? একটা দেশে কর্মক্ষম জনগণের যত অংশ (১৫-৬০ বছর বয়সী) কোনও ধরনের চাকরি বা কাজে যুক্ত, অথবা কাজ খুঁজছেন, সেই অংশটি। এই লেবার ফোর্স পার্টিসিপেশন রেট থেকে বোঝা যায় একটা অর্থনীতিতে চাকরির প্রকৃত চাহিদা কতটা। মোট শ্রমশক্তির যত শতাংশ চাকরি খুঁজছে, কিন্তু এখনও পায়নি, তাই হল বেকারত্বের হার। সারা বিশ্বে এটাই প্রচলিত। কিন্তু ভারতে বেকারত্বের সঠিক হিসাব পাওয়ায় সমস্যা হল, এখানে লেবার ফোর্স পার্টিসিপেশন রেট অদ্ভুতভাবে কমছে। চাকরি হচ্ছে খুবই কম। তা হলে এই হার কমছে কেন? বিরাট অংশ কমে যাচ্ছে হতাশ হয়ে, দীর্ঘ চেষ্টার পর বিরাট অংশ চাকরির আশা ছেড়ে দেয় বলেই লেবার ফোর্স পার্টিসিপেশন রেট কমে যায়। ফলে কাজ পাচ্ছে না। অথচ কাজ খোঁজার আশাও চলে যাচ্ছে।

এবার দেখা যাক বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষের মধ্যে চাকরির হার, অর্থাৎ কর্মরত ও কর্মক্ষম মানুষের অনুপাতটি কেমন। লোকনীতি-সিএস ডি এস দেখাচ্ছে, ২০১৬-১৭ সালে অর্থাৎ মোদি সরকারের দ্বিতীয় বছরে হিন্দুদের চাকরির হার ৪৩.২১ শতাংশ, মুসলিমদের মধ্যে ৩৯.৯৫ শতাংশ, খ্রিস্টানদের মধ্যে ৪০.৯১ শতাংশ, শিখদের মধ্যে ৪১.৬ শতাংশ। তথ্য দেখাচ্ছে মুসলিমদের মধ্যে চাকরির হার কম। অথচ দেশে বিজেপি ও তার দোসররা উল্টো কথা বলে চলেছে। মোদি সরকারের দশ বছরের মাথায় পরিস্থিতি কী দাঁড়াল? হিন্দু-মুসলিম-খ্রিস্টান-শিখ— সকলেরই চাকরির হার কমে গেল। ২০২৩-'২৪ সালে হিন্দুদের মধ্যে চাকরির হার ৩৭.২৬ শতাংশ, মুসলিমদের মধ্যে ৩৫.৫ শতাংশ, খ্রিস্টানদের মধ্যে ৪০.৪৩ শতাংশ, শিখদের মধ্যে ৩৭.৪ শতাংশ (তথ্যসূত্র ঃ ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস— ২৫-০৫-'২৪)।

মোদি শাসনে কেন সব ধর্মের মানুষের মধ্যে চাকরির হার কমল? এর পিছনে রয়েছে বিজেপি সরকারের শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী নীতি, কর্মী ও কর্মসংকোচন নীতি এবং অর্থনীতির মন্দার কারণে জনগণের ক্রয়ক্ষমতা কমে যাওয়ার দরুন শিল্পায়ন না হওয়া ইত্যাদি নানা বিষয়। এই সংকট দূর করার কোনও পথ কোনও বুর্জোয়া জোটই দেখাতে পারে না। এক সময় কংগ্রেস বলত, বেকারত্বের কারণ হল যোগ্যতার অভাব। এ কথাও মিথ্যাচার বলে প্রমাণিত। সম্প্রতি খবরে প্রকাশিত হয়েছে আইআইটি পাশ ৩৮ শতাংশ পড়ুয়া এ বছর চাকরি পায়নি।

ইঞ্জিনিয়ারিং ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আইআইটিতে দেশের অন্যতম মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা পড়ার জন্য মুখিয়ে থাকেন। এতদিন আইআইটি পাশ করা কোনও ছাত্রকে চাকরির জন্য কারও দরজায় কড়া নাড়তে হত না। সেখানেও এখন বেকারত্বের তীব্র সংকট।

তথ্য জানার অধিকার আইনে আইআইটির এক প্রাক্তনী বেকারত্বের বিস্ফোরক তথ্য সামনে এনেছেন। সেই তথ্যে দেখা যাচ্ছে ২০২২ সালে দেশের ২৩টি আইআইটির ১৭,৯০০ জন ছাত্র চাকরির জন্য নাম নথিভুক্ত করান। এদের মধ্যে ১৯ শতাংশ চাকরি পাননি। ২০২৩ সালে চাকরি পেতে নাম লেখান ২০ হাজার পড়ুয়া। এর মধ্যে কাজ না পাওয়ার হার ২১ শতংশ। আর ২০২৪ সালে ক্যাম্পাসিং-এ আবেদন করেন ২১, ৫০০ জন পড়ুয়া। কাজ পাননি ৩৮ শতাংশ (সূত্র ঃ বর্তমান ২৩ মে ২০২৪)। কেন পাননি? যোগ্যতার অভাব? আদৌ তা নয়। ১৯৯১ সালে প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের নেতৃত্বে কংগ্রেস সরকার বিশ্বায়ন তত্ত্ব নিয়ে আসে। তার অন্যতম শর্ত বেসরকারিকরণ, ডাউন সাইজিং। নতুন কর্মক্ষেত্র তৈরির বদলে সঙ্কুচিত হচ্ছে। মনমোহন সিংয়ের এই নীতিই তো বিজেপি সরকার অনুসরণ করে চলেছে। ফলে সরকারের বদল হলেও নীতির বদল হয়নি। সেই কারণে, শুধু সরকারের বদল দ্বারা জনজীবনের এই সমস্যা দূর হতে পারে না। যে অর্থনীতি অবিরত বেকারত্বের জন্ম দিয়ে চলেছে তাকে সমূলে উপড়াতে না পারলে এই সমস্যার সমাধান নেই।

দেশের মানুষের অভিনন্দন প্রাপ্য

সদ্যসমাপ্ত লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে এস ইউ সি আই (সি)-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ৬ জুন নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়েছেন।

শাসক বুর্জোয়া শ্রেণি আরও একবার তাদের বিশ্বস্ত সেবাদাস বিজেপিকে নানা উপায়ে কেন্দ্রীয় ক্ষমতায় বসানোর— যদিও কম শক্তি নিয়ে— বন্দোবস্ত করল। এ জন্য তারা বিজেপিকে বিপুল পরিমাণ টাকা, বশংবদ আমলাতন্ত্র ও কেনা-গোলাম সংবাদমাধ্যমের শক্তি জুগিয়েছে।

পাশাপাশি হিন্দুত্ববাদী সাম্প্রদায়িক প্রচারকে চরম উচ্চতায় নিয়ে গেছে। জাতপাতের বিভেদে ইন্ধন দিয়েছে। সব কিছু দেখেও সরকার মনোনীত নির্বাচন কমিশন নীরব দর্শক হয়ে এ সবে প্রশ্রয় দিয়ে গেছে। এই নির্বাচন আবার প্রমাণ করল, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের ধুয়া বাস্তবে নিছক লোক-ঠকানোর একটি উৎকৃষ্ট উপকরণ। তবে দেশের জনগণের অবশ্যই অভিনন্দন প্রাপ্য। কারণ তাঁরা বিজেপিকে নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা দেননি।

এই নির্বাচনে একটা ভয়াবহ ছবি দেখা গেল। যেখানে প্রতিদ্বন্দ্বী বুর্জোয়া দলগুলি, বিশেষত বিজেপি গদি দখলের উদগ্র লালসায় কাদা-ছোঁড়াছুড়িতে, নোংরা ভাষা প্রয়োগে, এমনকি বিরুদ্ধপক্ষকে অশ্লীল আক্রমণে সকল সীমা ছাড়িয়েছে, শঠতা ও মিথ্যাচারের স্রোত বইয়ে দিয়েছে। এও প্রমাণিত হল, মহিমান্বিত বুর্জোয়া সংসদীয় গণতন্ত্র আজ একটা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে এবং তার জায়গা নিচ্ছে ফ্যাসিস্ট স্বৈরাচার। সংস্কারবাদী বামপন্থী সোসাল ডেমোক্রেটিক শক্তি সিপিআইএম ঐক্যবদ্ধ বামপন্থী আন্দোলনের রাস্তা পরিত্যাগ করে বিকল্প বুর্জোয়া জোটের লেজুড়বৃত্তি করতে গিয়ে আরও একবার নিজেকে ধিক্কৃত করেছে।

জনগণকে বুঝতে হবে, কেবলমাত্র সরকার পরিবর্তন তাদের দারিদ্র্যপীড়িত জীবনে কোনও পরিবর্তন আনবে না, তেমনই যে জ্বলন্ত সমস্যাগুলি তাদের জীবনকে বিপর্যস্ত করছে, তারও কোনও সমাধান হবে না।

আজকের দিনের জরুরি প্রয়োজন হল, নির্মম বুর্জোয়া শোষণের অবসান ঘটানোর লক্ষ্যে সর্বহারা বিপ্লবী নেতৃত্বে এবং উন্নত সাংস্কৃতিক-নৈতিক মানের ভিত্তিতে শ্রেণিসংগ্রাম ও গণসংগ্রামগুলি গড়ে তোলা।

বাঁকুড়ায় মন্ত্রীপতন!

অষ্টাদশ লোকসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণা হতেই বিভিন্ন দল ও তার প্রার্থীদের ফল নিয়ে দৈনিক কাগজের লেখালেখি, সোসাল মিডিয়ার নানা প্রচার মুখে মুখে ভাইরাল হয়। মুখর এই জনতারই একজন বাঁকুড়ার এক লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক এস ইউ সি আই সি দলের এক কর্মীর দেখা পেয়ে বলেন, আপনারাই কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকারের চরম অগণতান্ত্রিক, অবৈজ্ঞানিক, অমানবিক, যুক্তিহীন, ব্যয়বহুল জাতীয় শিক্ষানীতির প্রতিবাদে ধারাবাহিক আন্দোলন করছেন দেশ জুড়ে। নানা ক্ষেত্রে তার প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে। এখানেও শিক্ষাপ্রেমী বাঁকুড়াবাসী পরাজিত করেছেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী বাঁকুড়ার ভূমিপুত্র ডাঃ সুভাষ সরকারকে।

তিনি এ-ও উল্লেখ করেন, কয়েক দশক আগে বিগত বামফ্রন্ট সরকারের আমলে প্রাথমিকে ইংরেজি ও পাশফেল তুলে দেওয়ার বিরুদ্ধে এস ইউ সি আই সি র গড়ে তোলা আন্দোলনের ফলে যে জনমত তৈরি হয়েছিল তাতেই বাঁকুড়াবাসীর কাছে হারতে হয়ে ছিল তদানীন্তন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী বাঁকুড়ার ভূমিপুত্র অধ্যাপক পার্থ দে-কে। বললেন, নানা চাপে পড়ে আপনাদের ভোট দিতে না পারলেও আপনাদের ধারাবাহিক শিক্ষা আন্দোলন জনসাধারণের হৃদয়ে গাঁথা হয়ে রয়েছে। আপনাদের আন্দোলনেই বাঁকুড়াবাসীর গৌরবগাথা রচিত হল।

Editor : Amitava Chatterjee ■ Printed & Published by Amitava Chatterjee on behalf of SUCI (C), West Bengal State Committee from 48 Lenin Sarani, Kolkata 13 ■ Printed at: Ganadabi Printers and Publishers Pvt. Ltd. ■ 52B Indian Mirror Street, Kolkata-13 ■ Phone: 9433451998, 9432889347 ■ E-mail: ganadabi@gmail.com ■ Web: https://ganadabi.com